দিশারী
২০২১

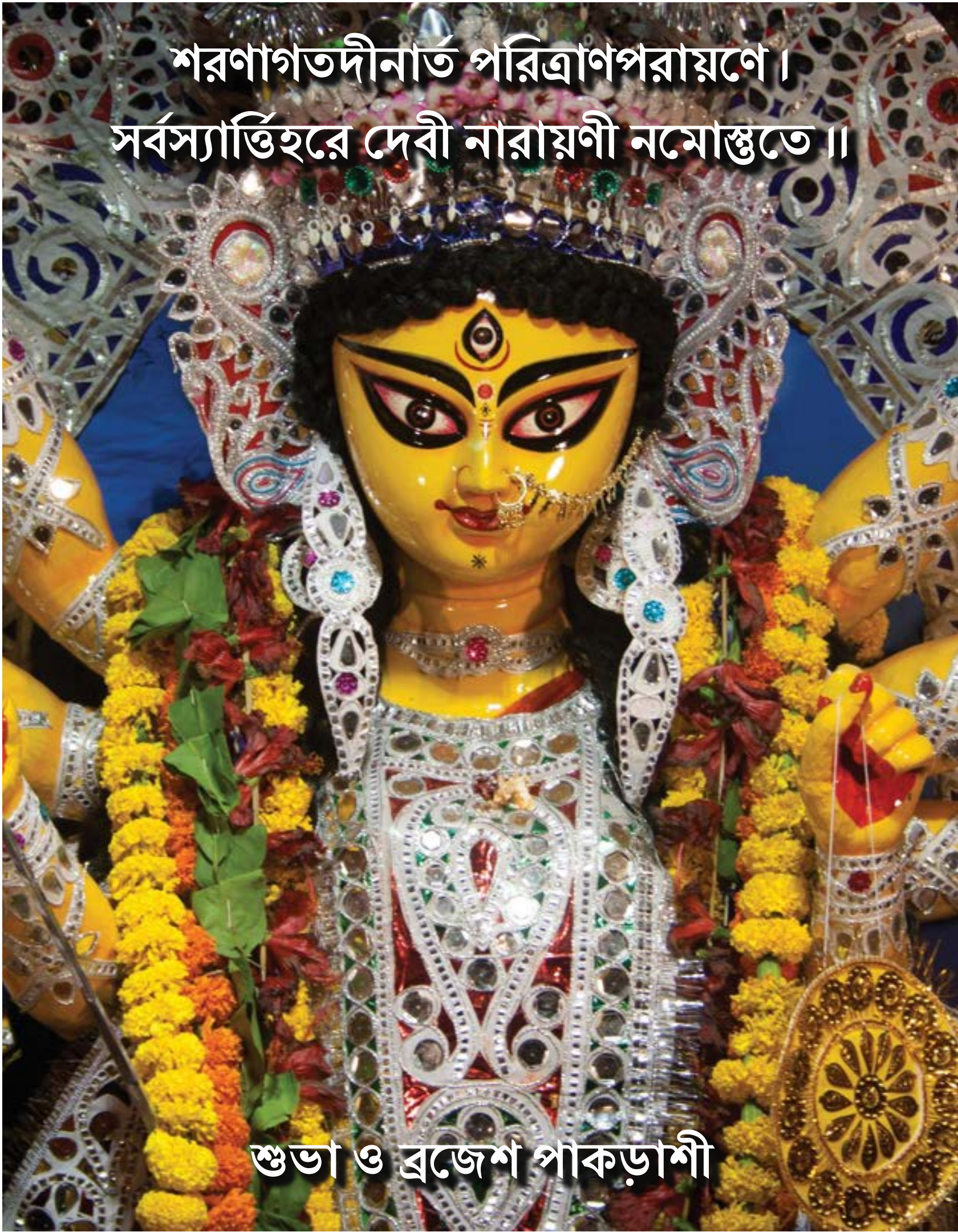
শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে ।।
শুভা ও ব্রজেশ পাকড়াশী

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সুজিত, বৈশাখী, সুরঞ্জিত ও সঞ্জনা

Best Wishes and Puja Greetings

Rihan, Tithi, Arka, and Tarun Podder

মাতৃমন্দির পূন্যঅঙ্গন কর মহোজ্জ্বল...

Seasons Greetings to all our friends in the community

Rakesh, Ravi, Rimi, David, Arjun, Anita, Lily, Aria, Sipra & Amiya Banerjee

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ

অমিতাভ চৌধুরী

সম্পাদকীয় • 7

From The Presidents Desk • 11

Executive Committee 2021 • 15

Know Your EC 2021 • 17

Puja Schedule • 19

Income Statement for 2020 • 21

Sub-Committees 2021 • 23

গল্প ও বিশেষ রচনা

দোহাই • পল্লব ভট্টাচার্য্য • 27

Silver Linings & Silver Bells • Rajonya Pramanik • 29

For the love of eating out • Taniya Talukdar • 31

স্মৃতির আমেজ • ব্রজেশ পাকড়াশী • 37

Two Lemons • Swagata Chakraborty • 41

পাহাড় থেকে শিক্ষা • মিতালী দাস সিং • 45

সঠিক নাম জানি না • তিতাস মাহমুদ • 47

কাছের মানুষ স্বামী ভূতেশানন্দ • স্বপ্না ব্যানার্জী • 51

A Page from My Diary • Rajanya Bishi • 57

কবিতা

ছায়ানট তুমি • বর্ষণজিৎ মজুমদার • 61

ছায়াপাখি • ব্রতী ভট্টাচার্য • 62

আমাদের পরিচয় • মিতালী দাস সিং • 64

হারানো চিরকুট • সৌমেন ভট্টাচার্য • 65

আবাহন • তানিয়া তালুকদার • 66

A Theory of Everything • Jahar Haque • 67

ভ্রমণ

New York City Travel Log • Arjav Das • 73

রম্যরচনা

কান পেতে রই • সুজয় দত্ত • 79

Middle Name • ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী • 85

রান্নাবান্না

Lamb Boti Kabab • Ananya C Biswas • 87

অঙ্কন

অলিভিয়া নাথ • 91

দেবলীনা মাইতি • 92

ইন্দ্রাণী কর • 93

অনুশ্রী কুন্ডু • 94

অর্জুন কুন্ডু • 94

আনাভি বিশ্বাস • 95

আঁখি তালুকদার • 96

অনহিতা চৌধুরী • 97

অন্বেষা রায় • 97

আরিয়ান ঘোষ • 98

মধুমন্তী রায় বর্মন • 98

আইলীন ব্যানার্জী • 99

কল্যাণী দাস শর্মা • 99

নেহালি দে • 100

রোহন ঘোষ • 100

সৌরীশ মন্ডল • 101

ইন্দ্রাণী দাস শর্মা • 102

শৌর্য ভট্টাচার্য • 102

অনুষ্কা গোস্বামী • 103

ঋদ্ধিমা দেব • 103

আভান বিশ্বাস • 104

ঋষভ দেব • 104

গার্গী চৌধুরী • 105

সোনাক্ষি মন্ডল • 106

স্নেহাক্ষি মন্ডল • 106

সুমিত চক্রবর্তী • 107

সুমন চক্রবর্তী • 107

শারদ শুভেচ্ছা !

পাভেল, পিঙ্কেল, অমৃতা, কিংশুক

সম্পাদকীয়

लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥

Let the entire world be happy

আমরা সকলেই জানি যে বর্তমান সময়ে আমরা সবাই একটা জরুরি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সমগ্র বিশ্ব এখন করোনা ভাইরাস নামক ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে দিশেহারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারো বছরের উর্ধ্বে করোনার টিকাকরণের পরেও চারিদিকে যেন একটা অনিশ্চয়তা, ভয় ও আতঙ্ক কাজ করছে।

জীবনানন্দের ভাষায়
"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন…"

মহামারীর মন খারাপের মেঘ ক্লিভল্যান্ডকেও স্পর্শ করেছে। আমাদের সকলের সমবেত প্রার্থনা যেন এই ঝড় আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

পরিস্থিতির গুরুত্ব কে সামনে রেখে নেতিবাচক দৃষ্টি নয় বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের এই লড়াইয়ে বিজয়ী হতে সহায়তা করবে।

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার প্রাক সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে শরৎ এর আগমন ঘটেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। কলকাতা আর ক্লিভল্যান্ড এর আকাশে এখন একই রং। যেখানে রাস্তার ধারে গাছের খোঁপায় শিউলি, যেখানে কাশফুল দল বেঁধে গায়ে গা লাগিয়ে গল্প করে সেই গঙ্গাপাড়ের কুমোরটুলি থেকে ঠাকুর পাড়ি দিয়েছেন লেক ইরির ধারে আমাদের এই প্রিয় শহরে। শরৎ নিয়ে এসেছে উৎসবের প্রতিধ্বনি, আনন্দের অঞ্জলি।

ক্লিভল্যান্ড এ ঢাকের ডাকে দেবী বন্দনার উচ্ছ্বাস। ক'টা দিন রোজকার কর্মব্যস্ততাকে দূরে রেখে দশভূজার আগমন নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে। শরৎ এর ক্লিভল্যান্ড এ শারদোৎসবের সুর। বোধন থেকে অধিবাস সবকিছুতেই মনে হয় মেজাজে,

রেওয়াজে ঠিক যেন একটুকরো বাংলা। তাই প্রবাসের কোনো গীর্জার মঞ্চও যেন হয়ে ওঠে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনই হল প্রবাসের দুর্গোৎসবের মূল সুর। তাই অকালবর্ষণ, ঠান্ডার প্রকোপ, কখনও অসময়ের তুষারপাত সত্ত্বেও আন্তরিকতার উষ্ণতায় ভৌগোলিক সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে দুর্গাপুজোর আমেজে ভেসে যায় আপামর বাঙালি।

এই শারদোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত আমাদের বার্ষিক পত্রিকা যাঁরা নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

দেবী আরাধনার প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ক্লিভল্যান্ড এর বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার কার্যনির্বাহকবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বসুধা তুমি সেরে ওঠো এই প্রার্থনা রইল।

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ

কার্যনির্বাহী সমিতি, ২০২১

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো

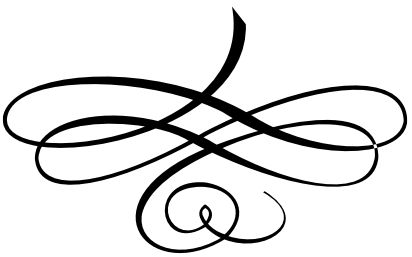

শারদীয় অভিনন্দন

Mrinal Anjali

Anjan & Monica, Reema & Ria

From The President's Desk

October 1, 2021

Without a doubt, the year 2020 had been one of the most challenging years for all of us due to the COVID-19 pandemic. As we embarked on a new year, 2021, we believed it would bring a whiff of fresh air to our lives. However, things turned out differently, with the emergence of the Delta variant and ever-increasing Covid cases, 2021 brought on more challenges and uncertainties.

Our community too has been hit pretty hard, directly or indirectly by the pandemic. Many of us are still grieving the loss of loved ones. While I believe time will slowly heal all wounds, a few years from now when we will look back and reflect, we will see how a difficult time created opportunities for us to learn, share and give back to the society.

In the times that we are living in now, gatherings and planning events have become increasingly complicated and demanding. We, the Executive Committee of Bengali Cultural Society also faced tremendous challenges. The health and well-being of our community members have always been our top priority and therefore, we had to cancel some of our annual events. We had to pick our brains and come up with creative ideas to redesign our events, which has always followed a set format, in a very short span of time. I want to thank all of our Executive Committee members and the volunteers of our organization, for their willingness to give their time and effort to our community. We all are a close-knit

family. If there is anything more that we can do for our members, please don't hesitate to contact any of our Executive Committee members.

As the sun starts to set early in the evening, and cooler temperatures sweep in, autumn has arrived with its subtle sweet breath - the scent of festivities is in the air! I, on behalf of Executive Committee 2021, wish you all a Subho Sharodiya! May this festive season bring immense peace and happiness to our lives!

Sincerely,

Kingshuk R. Das

President

2021 Executive Committee

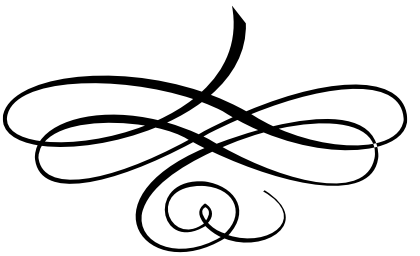

Executive Committee 2021

President

Kingshuk Das

Vice-Presidents

Brati Bhattacharya

Taniya Talukdar

Secretary

Arunabha Kundu

Treasures

Rajib Pramanik (January-September)

Rupak Deb

Jayatu Das Sarma (October-December)

Cultural Secretaries

Gargi Chowdhury

Jayatu Das Sarma (January-September)

Youth Coordinators

Aankhee Talukdar

Riddhima Deb

Wriddhi Nandan

Sanjana Ghosh

Rajonya Pramanik

Debojoyee Sadhukhan

Trustees

Soumitra K Ghosh

Bhaswati Bandyopadhyay

Jaharul Haque

HAPPY

Durga Puja

From the Roy family: Swapna, Bikram, Taniya, Sanjoy
Melina, Samantha, Anwesha, Camille, Sasha, Rosalyn

Know Your EC 2021

Puja Schedule

Durga Puja Schedule

Friday, 15th October, 2021

7:00 PM: Kid's Virtual Cultural Program

Saturday, 16th October, 2021

Morning Schedule

10:00 AM: Gate Opens

10:00 AM: Morning Puja Starts

12:01 PM: Pushpanjali

1:00-2:00 PM: Members to Collect Food and exit

Evening Schedule

5:30 PM: Gate Opens

6:30 PM: Sandhya Arati

7:30 PM: Collect Food and exit

8:30 PM: Gate Closes

9:30 PM: Live Virtual Concert by Iman Chakraborty from Kolkata

Sunday, 17th October, 2021

11:00 AM: Virtual Cultural program by BCS Members

12:15 PM: Gate Opens

12:30 PM: Dashami Puja and Pushpanjali

1:30 PM: Pratima Bisharjan

1:30 PM-2:00 PM: Collect Food and exit

3:00 PM: Gate Closes and Wrap Up

Lakshmi Puja Schedule

Saturday, 23rd October, 2021

5:00 PM: Gate Opens

5:30 PM: Puja & Pushpanjali

7:00-7:30 PM: Collect food and exit

8:00 PM: Gate Closes and Wrap Up

9:30 PM: Live Virtual Concert by Anweshaa Dutta Gupta from Mumbai

শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ...

তৃণা, এ্যালিসা, প্রান্তিক, সমীরা

গোপাল ও শিপ্রা সাহা

Sub-Committees 2021

Priests:

Brojesh Pakrashi (Convener)

Smarajit Bandyopadhyay

Kaushik Ghoshal

Puja Preparation:

Anuradha Bhadra (Convener)

Shyamasree Datta

Suparna Mazumder

Ambalika Das Gupta

Bhog:

Sumitra Bhattacharya

Puja Mandap Decoration:

Gargi Chowdhury

Amitava Chowdhury

Jayatu Das Sarma

Rupak Deb

Chumki Deb

Advisor:

Subha Sen

BCS Volunteers:

Utpal Datta

Mukta Ghosh

Babita Basu

Mitali Das Singh

Anil Singh

Ambalika Fas Gupta

Barsanjit Mazumder

Jaydip Das Gupta

Pallab Bhattacharya

Partha Sen

Food Committee:

Rajib Pramanik

Debjani Kundu

Punam Pramanik

Brati Bhattacharya

Mahua Das Sarma

Chumki Deb

Gargi Chowdhury

Taniya Talukdar

Amrita Nandi

Fundraising and Advertisement:

Rajib Pramanik

Taniya Talukdar

Gargi Chowdhury

Brati Bhattacharya

Arunabha Kundu

Jayatu Das Sarma

Amitava Chowdhury

Rupak Deb

Soumen Bhattacharya

Amrita Nandi

Kingshuk Das

Magazine and BCS Directory:

Soumen Bhattacharya (Convener, Artworks)

Amitava Chowdhury (Cover)

Amrita Nandi (Editor)

Gargi Chowdhury

Rupak Deb

Taniya Talukdar

Kingshuk Das (Directory)

Cultural Program and Technical Help:

Gargi Chowdhury

Mahua Das Sarma

Jayatu Das Sarma

Amitava Chowdhury

Soumen Bhattacharya

Kingshuk Das

Web and Social Media:

Kingshuk Das (Convener)

Soumen Bhattacharya

Taniya Talukdar

Youth Volunteers:

Aankhee Talukdar

Riddhima Deb

Wriddhi Nandan

Sanjana Ghosh

Rajonya Pramanik

Debjoyee Sadhukhan

Special Thanks:

Anjan Ghosh (BCS Archival Photos)

দোহাই

পল্লব ভট্টাচার্য্য

দোহাই আপনাদের। দোহাই সকলকে। আর ভদ্রতা করবেন না। যদি কিছু বলার থাকে তো মুখ ফুটে বলুন। অনেক ভদ্রতা হয়েছে। অনেক হয়েছে "এ মা, এ'কথা কি জিজ্ঞেস করা যায় না কি যাকে তাকে?" "আরে ও টিকে নিয়েছে কি না নিয়েছে তা দিয়ে আমার কি? আমি তো নিয়েছি দুইবার। ওকে বিরক্ত করবো কেন?" কয়েক মাস আগে শুনতাম "অমুকদা ঠিক মতন মাস্ক পরেন না, তবে আমি কিছু বলিনি, যদি কিছু মনে করেন", এইরকম আরও কত কিছু। কি পেয়েছি এই ভদ্রতা করে আমরা? মৃত্যু আর হাহাকার। যদি আমরা মনে করি যে কারও টিকে নেওয়া বা ঠিক মতন নাক মুখ ঢাকা উচিৎ, আমাদের কি সেই ক্ষেত্রে পথ দেখানো দায়িত্ব নয়? অথচ কোন দোকান থেকে বাজার করা ভালো, কোন গাড়ি কেনা ভালো, প্রত্যেক পদে তো আমরা দিব্যি পথ দেখাই, তবে এই ক্ষেত্রে আমরা চুপ কেন?

দোহাই আপনাদের। আর বলবেন না, "ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি দুইবার টিকে নিয়েছি। আমার কিছু হবে না"। ভয় পাই কেন জানেন? সেই শিশুর জন্য যে টিকে পায়নি। সেই মানুষটির জন্য যে কিনা সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও টিকে নেননি বা নিতে পারেন নি। আমরা কেউ কি হলফ করে বলতে পারি যে আমাদের থেকে কারও সংক্রমণ হয়নি? বলতে পারি না। আর অবশ্যই ভয় পাই নিজের জন্য।

দোহাই আপনাদের। আর বলবেন না, "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে"। এ কথা অনস্বীকার্য যে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু একথাও ঠিক যে বিশ্বজুড়ে যে প্রায় ৫ মিলিয়ন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন এই অতিমারিতে, তাঁরাও ছিলেন সেই সমাজের অংশ। সামাজিকতা অবশ্যই করবো আমরা, কিন্তু বাধানিষেধ মেনে করতে অসুবিধে কোথায়? সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল থেকে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, সেগুলোকে বিকৃত করে নানা রকম ব্যাখ্যা করাটা কি বাঞ্ছনীয়? কিন্তু অতি সহজে আমরা সেটাই করছি নিজেদের সুবিধে মতন।

দোহাই আপনাদের। রাজনৈতিক নেতা/নেত্রীদের দোষ দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। আমরা ভালো করেই জানি যে ঐ সব তথাকথিত নেতা/নেত্রীদের ক্রিয়াকর্ম কোনো রকম যুক্তি তর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা আমাদের সাধ্য নয়। কিন্তু আমরা তো পারি, দোকান বাজারে কেউ যদি ঠিক মতন নাক মুখ না ঢেকে থাকেন, তাহলে তাঁকে মুখ ফুটে ভদ্রভাবে কিছু বলতে, চেনা অচেনা মানুষদের বলতে টিকে নিতে। আমরা তো পারি সব রকম বাধা নিষেধ মেনে চলতে (নিজের সেটা পছন্দ না হলেও), কম করে এই কথা ভেবে যে আমাদের সেই জীবনযাত্রার জন্য পৃথিবীর কোথাও একজন তার প্রিয়জনকে হারাবে না।

দোহাই আপনাদের। একথা বলবেন না যে "আমরা ভালো আছি", কারণ ভালো আমরা থাকতে পারিনা। আমরা হাসি ঠাট্টা করতে পারি, কিন্তু ভালো কি করে থাকতে পারি যখন এখনও প্রতিদিন এই অতিমারিতে বহু মানুষ তাঁদের প্রিয়জনকে হারাচ্ছে। এখনও দেখি নানা রকম সামাজিক মাধ্যমে এই অতিমারিকে নিয়ে হাস্যকৌতুক। সেই কৌতুকে যদি আমরা হাসতে পারি, তবে মানুষের প্রতিনিয়ত মৃত্যুতে আমরা কাঁদিনা কেন?

আসুন আমরা শপথ নিই, আমাদের যেটুকু কর্তব্য, তা আমরা পালন করবো। আমাদের বিজ্ঞানী হতে হবে না, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের যে অনেক দায়িত্ব এই অতিমারির গ্রাস

থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করার! আমাদের জীবনযাত্রা দিয়ে আমরা পারি অনেক পরিবর্তন আনতে। এই প্রথম মনে হয় যে ভীতু হওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। প্রিয়জনকে যে আমরা চাই। আমরা যে প্রিয়জনের আওয়াজ শুনতে চাই। আমাদেরই অসাবধানতার জন্য যেন সেই প্রিয়জন আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে না যায়।

Silver Linings & Silver Bells

Rajonya Pramanik

Sierra McLean is late again. But she still has to get coffee. So, she drives as fast as possible to the Starbucks near her house. Afterall coffee is life.

Sierra runs in. The silver bell on the door jingles cheerfully.

The moment she enters the loudness of the T.V hits her. She has never heard it this loud before. Sierra looks at the T.V and realizes that everyone in the café is looking at it. She just reads the headline. That's enough to make her feel dizzy.

"SCHOOLS & OFFICES CLOSED IN OHIO UNTIL FURTHER NOTICE"

"But..." She checks her email. Schools are closed? Then how are children supposed to learn? And offices? How is she supposed to work? And why is the dang Inbox not loading?

Just when she's had enough with the spinning wheel on the screen, it finally loads. She checks for new emails. None. Is this some kind of joke? If her office was closed won't she at least get a notice? She checks her junk emails. And there it is. Between all those Macy's discounts and Kohl's Clearings sales. The one email that changes everything.

Dear Delroit staff,

We are sorry to inform you that from today on, until further notice, all of our company buildings are closed, and the staff members have to start working from home. Due to the new crisis of the Covid-19 pandemic we are being forced to shift to complete virtual working. Hopefully we will be back to the buildings soon. For more information, please visit ***www.delroitstaff.covidprocedures.com***

Ryan Reynolds,

CEO, Delroit Companies

Sierra falls onto a nearby chair. A pandemic? She hadn't even heard that word before. Sure, she had seen headlines about a virus spreading in China. About people wearing masks. When did it become so big?

She goes out of the café with more questions than answers. The bell jingles again. It sounds a little weaker though, like the bell has had it with the world. Like it has given up trying to cheer people up, after all a freaking pandemic had hit.

During the day, all those history lessons, about the Spanish flu, the Black Plague, and even the SARS virus, explode in Sierra's head. She'd always thought of them like everyone else did. Like the American Revolutionary War, like the Treaty of Paris···like history. But as we all know, history repeats itself.

2 months later:

Sierra cuddles the puppy, Patty, on her lap. She couldn't believe that she had got it. The one good thing. The one ray of sunshine in the blizzard. She had seen Patty on a pet adoption website while scrolling through Facebook. The alternative option was for it to be euthanized. And for such an adorable puppy to be euthanized... So, she'd just got it. She had wanted a pet since she was four and she had so much time at home anyway. It was nice to share it with someone. Especially someone as cute as Patty.

Sierra smiled more than she ever did, when she was with Patty. The day she got her, she'd been afraid that the puppy wouldn't like her. She had never had pets before. But when she'd been taken out of the cage, she ran right into Sierra's arms, like she'd been waiting for her all these years. Waiting for escape. Now she knows how much Patty loves her. She even runs to Sierra when she comes back from the grocery store.

The tiny black poodle jumps, full of soft fur, from her lap and starts to run around the room. She does that sometimes, when she is overjoyed. So was Sierra. Overjoyed. If she said that to someone right now, they would laugh, but she didn't care. Even better, she was ecstatic.

For the love of eating out

Taniya Talukdar

I come from a middle-class Bengali family. We had a very simple and sheltered childhood back in Shillong, the capital of Meghalaya, one of the northeastern states of India.

Growing up, our visits to restaurants were seldom and when it happened, it was special. We'd look forward to having Mishti (Sweets) and Shingara (Samosa) sitting at the "restaurant" which really was a corner sweet shop near where we went out for our annual Puja shopping.

This was an adventure we'd look forward to, while Maa and Baba sipped on their tea, my sister and I would try to figure out how to hold the spoon to be able to conquer the Mishtis on our plates. That too, wearing our matching outfits that we got the year before as our Puja gift.

Our brush with restaurants would also happen in the forms of Jalebis from Delhi Mistanna Bhandar or cakes from ECee's or egg rolls during Puja pandal hopping.

Sometimes, it would be in the form of makeshift restaurants at the Pandal premises to eat ghugni, vegetable chop, momos, vegetable chow mein and the likes. The taste would linger long after the food was digested after endless walking to see one Pratima after another.

That's the beauty of living in small towns, you never really needed a vehicle to go places - the legs were enough. However, I don't think we could freely indulge in any of the delicacies laid in front of us. The warning - bairer kichu khele pet kharap hobe - was omnipresent in our minds.

So of course, our choices were always limited. But we weren't even that demanding, we come from the Baangal era and a place where aloo sheddo bhaat would be enough for us to finish ek thala bhaat. Those simple pleasures brought us a lot of joy - something similar to fast food for kids nowadays.

Then in 1991, my father got transferred to Guwahati and there the options seemed to open

up a bit more, bigger city et al. While we got to see a lot more restaurants on our long bus rides to school and back, it was only during Durga Puja that we got the chance to sit and eat masala dosa at the famous Woodlands Hotel.

There used to be long queues outside the restaurant every evening of the three days of Puja, but everyone waited patiently to grab a bite. It was a matter of prestige to have had a meal there during the festivities.

Being a Bengali also means that you like to travel. Having done small time traveling here and there, our first exotic travel destination, Goa happened in 1993 when I was in 7th grade. It was the first time that we really enjoyed eating a proper meal at an actual restaurant, maybe even ordering off of a menu. The butter chicken and roti never tasted so good, mainly because I hadn't tasted butter chicken until then!

From then on, we grew from strength to strength, so to speak.

My mother is a foodie, while my father has a few set things he'd eat outside. For example, dahi vada, and he passed on that to me. The famous Mishti Mukh would serve great dahi vadas and when I started high school, I'd save some money from the bus fare allowance and would satiate my tastebuds with those famous dahi vadas every now and then.

When I moved to Bangalore in 1999 for my graduation, that's when my long term relationship started with restaurants and eating out. Food at the hostel was not always good, and so, we'd end up eating out most times. That's when I started missing home-cooked food and understood the value of something that I had taken for granted so far.

After the endless dosas, parathas, chicken curries, egg puffs, and the likes, when I went back home for the first time, people could barely recognize me - all the outside food had clearly left an impression on my body weight.

Gradually, Bangalore transformed into this city with world class restaurants with food of different cuisines. And, I started making friends with one foodie after the other - would the adventure ever stop? From Chinese to Thai to Italian to continental to the homegrown Nepalese food to the South Indian fare - what to choose and what to leave?

By then I had eaten more meals in restaurants than I have had at home. But the best was yet to come, or perhaps the worse - however we look at

it. I met my husband - someone who considers it a punishment to eat home cooked food!

Being foodies, both of us have explored many restaurants together and continue to do so. However, I also love to cook, and being a fitness enthusiast, don't even ask how difficult it is to balance when there's so much to eat, I cook almost everyday. Especially so because of my children.

While the kids today will not understand how rare it was to eat at a restaurant back when we were growing up, I'd like to definitely continue to instill the importance of home-cooked food in them while being open to try out different cuisines when given the chance!

Image Courtesy: Mandira Choudhury

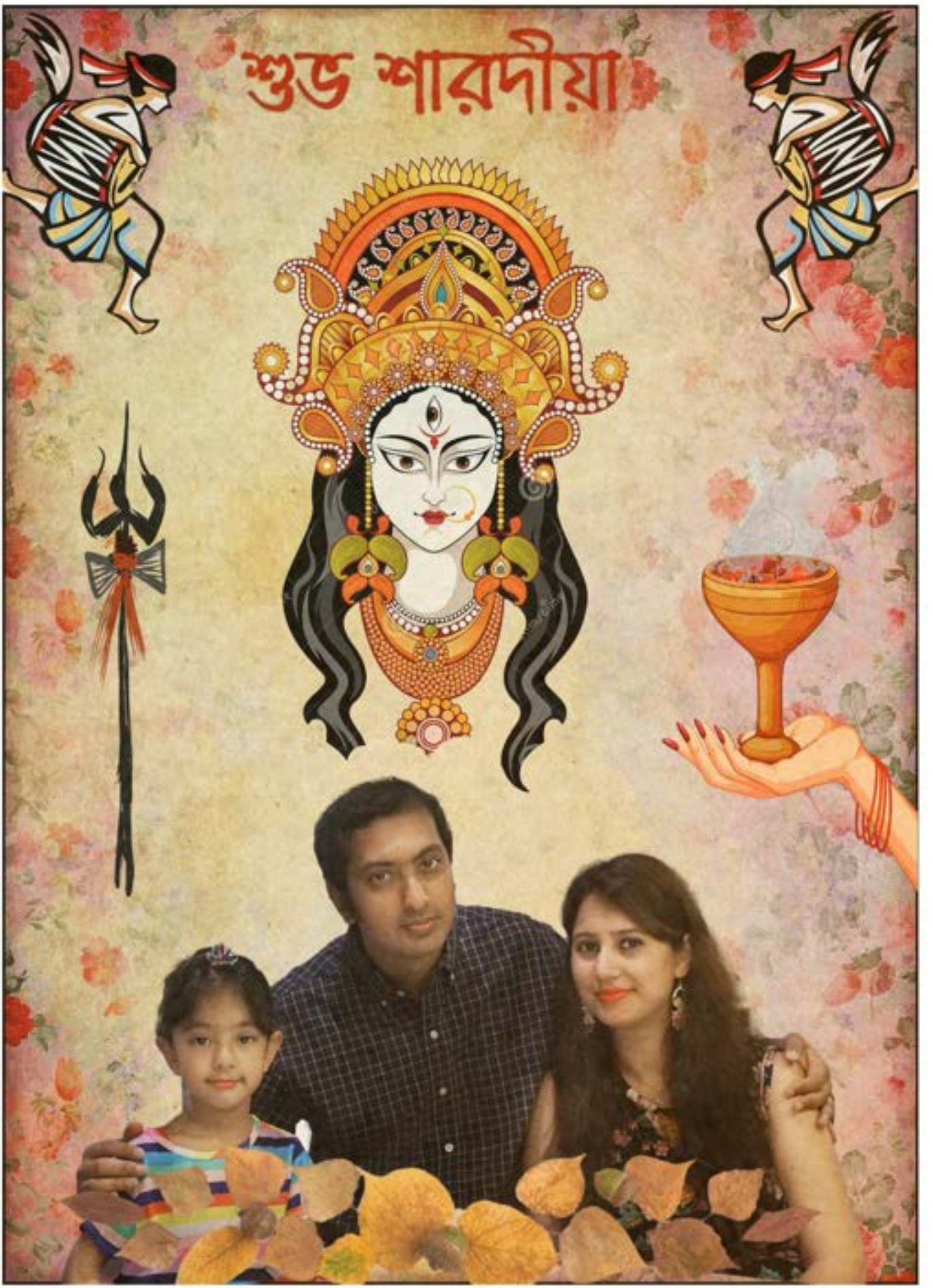

From Ayleen, Swagata and Kaustav...

স্মৃতির আমেজ

ব্রজেশ পাকড়াশী

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও
জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু কল্লোলরোল
বেজেছে সপ্ত তারে।
ওগো জননী এসেছে দ্বারে।।

বহুশ্রুত এই আগমনী গানটি গেয়েছেন স্বর্ণযুগের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী, যাঁদের খোঁজ পেলাম হঠাৎ YouTube এর মাধ্যমে। গানটি শোনামাত্র গানের কথা ও সুরের মিষ্টতায় মন ভরে গেল শান্তি ও আনন্দে। স্মৃতিপথে ফিরে এল ছেলেবেলার স্বপ্নালু অতীত জীবন। প্রতি দুর্গা পূজার সময় আমার দিদি গাইতেন এই আগমনী গীতি। সেই মধুমাখা কণ্ঠের অনুভূতি ও অতীত বিধুরতা বহু বৎসর পরেও আমার মনে এতটুকু ম্লান হয়নি। এই গানের স্মৃতির সঙ্গে সেই সময়ের জড়িত ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে ভিড় করলো। সেটাই আমার ছেলেবেলা।

আমাদের পরিবারের ভৌগলিক অবস্থিতি ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। শুনেছি আমাদের প্রজন্ম নিয়ে সেখানে ছিল আমাদের সাত পুরুষের বাস। আমাদের ছিল সচ্ছল মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার। বাড়িটা ছিল বড়ই। বাড়ির মাঝামাঝি ছিল একটা বড় ঘর। সেটি ছিল দুর্গা পূজার বেদী স্থান। তার সামনে নাটমন্দির। আর তার চারপাশে কতকগুলো ঘর। তার মধ্যে একটা ছিল আমাদের অর্থাৎ ছোটদের পড়বার ঘর। ভায়েদের সাথে সেখানে লেখাপড়া আর আড্ডা চলতো। সেখান থেকে খেলার মাঠে যেতে হতো দু'টো পাশাপাশি বৈঠকখানার মাঝের একটা গলিপথ পেরিয়ে। একটি বৈঠকখানার বারান্দায় প্রায় সারাদিন বসে থাকতেন আমার এক জ্যাঠামশায়। তাঁর সারাদিন সময় কাটতো গড়গড়ায় টান দিয়ে আর খবরের কাগজ আর অজস্র বই পড়ে। খবরের কাগজের বিশেষ খবরগুলি তিনি সযত্নে লাল কালির দাগে চিহ্নিত করতেন ভবিষ্যতে সম্ভাব্য উক্তির প্রয়োজনে বা তাঁর কোনও বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে। আমাদের মনে হতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু জানবার সবই যেন তাঁর নখদর্পণে। আমরা ছিলাম তাঁর স্নেহার্দ্র দীর্ঘায়িত উপদেশ মুষলের সহজ শিকার। খেলার মাঠে ঐ বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যেতেই হতো। মন্দভাগ্য হলে ডাক পড়তো··· "জেঠু"···তখন তো আর উপায় নেই। আধ ঘন্টা ধরে চলতো সুভাষিতাবলীর বর্ষণ। যার সমাপ্তি ঘটতো নাটকীয় ভঙ্গীতে উদ্ধৃতি দিয়ে। যার উৎস কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, কখনও রবীন্দ্রনাথ, Shakespeare বা অন্য কোনও রচনাবলী। এর পর 'চরৈবেতি' বা 'এগিয়ে চলো' ছিল তাঁর প্রিয় পৌন:পুনিক নির্দেশ। আবার বলতেন যখনই সম্ভব বই পড়বে। লক্ষ্য রাখবে সবার ওপরে। হঠাৎ কখনও দাঁড়িয়ে

উচ্চকণ্ঠে বলতেন "What we become depends on what we read, after all the professors have finished with us." বা "He who aimeth at the sky shoots much higher than he who means a tree" ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই পর্যন্তই সেদিনের মত মুক্তি। মজা হল জ্যাঠামশায় ভুলে যেতেন আমাদের দাদা, ভাই, ভাগ্নেদের মধ্যে কখন কাকে কি উপদেশ দিয়েছেন। ফলে একই ভাষণ আমাদের একাধিক বার শুনতে হতো। এমন একটি ভাষণের মাঝে আমার এক দুষ্ট বুদ্ধি ভাগ্নে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো "যাচ্ছি দিদিমা"। যদিও দিদিমা অর্থাৎ আমার জ্যাঠাইমা ধারে কাছে কোথাও ছিলেন না। জ্যাঠামশায় অবশ্য এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করতে পারলেন না। ততক্ষণে ভাগ্নেটি ছুটে পালিয়ে গেছে।

বাড়িতে দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু হতো পুজোর মাস তিনেক আগে। তার বিভিন্ন স্তর। প্রথমে কাঠ দিয়ে কাঠামো তৈরি করতেন একজন ছুতোর। তারপর আসতেন হরে কৃষ্ণ কুমোর - আমাদের কুমোর কাকু আর তাঁর বড় ছেলে। খড় দিয়ে ও তার ওপর মাটি দিয়ে সম্পন্ন হতো 'একমাটি'। এটা প্রতিমা প্রস্তুতির প্রথম পর্ব। এক মাস লাগতো মাটি শুকোতে। তারপর হতো দোমাটি অর্থাৎ সুন্দর মসৃণ মাটি দিয়ে মূর্তি গুলি যথার্থ রূপ পেত। উৎসুক হয়ে দেখতাম ধাপে ধাপে প্রতিমা গড়ে ওঠার ছন্দ। এই সময়ই থাকতো আবার স্কুলের টার্মিনাল পরীক্ষা। তবুও অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে পরীক্ষার পড়ার ফাঁকে কেটে যেত কুমোর কাকার প্রতিমা গঠনের অবাক সৃষ্টি ও তাঁর শিল্পশৈলীর তারিফ করে। দোমাটির কয়েক সপ্তাহ পরে প্রতিমায় রঙ লাগাবার পালা। ততদিনে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। খেলাধূলা ভুলে দারুণ উত্তেজনায় তাকিয়ে থাকতাম রঙের ছোঁয়ায় প্রতিমাকে জীবন্ত হয়ে ওঠবার প্রত্যক্ষদর্শী হবার আশায়। মায়ের চক্ষুদানের সময়টা ছিল নাটকীয়। কুমোর কাকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন মায়ের মূর্তির সামনে। তারপর ঘাড়টা একটু হেলিয়ে কয়েক মুহূর্তে দিতেন তুলির টান। আমাদের চোখে মৃন্ময়ী মূর্তি হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো জননী স্বরূপা হয়ে। একে একে সব মূর্তির চক্ষুদান হয়ে গেলে শেষ চক্ষুদান হতো অসুরের। অন্য বাড়ির প্রতিমা থেকে অসুরের দৃষ্টি কতটা বেশি হিংস্র বা আসুরিক তা নিয়ে আমাদের বন্ধু মহলের বচসার শেষ ছিল না।

চক্ষুদান শেষ হবার পর কুমোর কাকা নিতেন পরিতৃপ্তির বিশ্রাম। হাসিমুখে তিনি দিতেন হুঁকোয় সুখটান। তারপর হুঁকোটা রেখে দিতেন একটু দূরে। তারপর তাঁর বড় ছেলে তার পিতৃদেবের দৃষ্টির আড়ালে দুর্গা চালার পিছনে সশব্দে হুঁকো সেবন করতেন। এই সামান্য প্রত্যক্ষ দ্বিচারিতা আমাদের ছিল বিশেষ হাসির খোরাক।

ষষ্ঠীর দিন থেকে শুরু হতো পুজোর প্রারম্ভানুষ্ঠান। কাঁসর ঘন্টা ঢাকের বাদ্যি। হৈ হুল্লোর। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে চেঁচামেচি, খেলা। নতুন জামা কাপড় পরবার উত্তেজনা, প্রসাদের ফল মিষ্টির অপর্যাপ্ত সরবরাহ- সে যেন অলীক কালের স্মৃতি। অবিমিশ্র আনন্দের তীব্রতা বোধ অল্প বয়সের সেই স্বপ্নিল সময়েই সম্ভব।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজোর পর স্নান করে শুদ্ধ মনে অঞ্জলি দেওয়াটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই ধার্য্য ছিল। শুধু উপোস করবার কড়াকড়ি ছিল না। ধরেই নেওয়া ছিল যে এই কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্বোধন গোঁফের অঙ্কুরের প্রকাশকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকতে পারে। অঞ্জলির অনুষ্ঠানটায় দাঁড়াতাম বৃহত্তর পরিবার গোষ্ঠীর সঙ্গে সমবেত হয়ে। পুরোহিত মশায়ের অঞ্জলি পাঠ আরম্ভ হতো গুরুগম্ভীর স্বরে:

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণ: প্রিয়াম

সর্ব্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম···।

[দুর্গতি নাশিনী মা তুমি মঙ্গলময়ী শান্তিদায়িনী দেবগণ প্রিয়া জগতাধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি, তোমায় প্রণাম।]

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রের সুর ও মন্ত্রের শব্দমাধুর্য্যে মুগ্ধ হতাম, যদিও তার অর্থ ছিল অর্ধবোধগম্য। বাকিটা সংস্কৃত শব্দ ঝংকারে আবৃত (মাইকেলের ভাষায় "চন্দ্রচূড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্নবী")।

অঞ্জলি দান ও শান্তিজল পর্ব সমাপ্তির পর মায়ের প্রসাদের সন্দেশ আর নারকেল নাড়ুর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি এমন সময় কাঁধে অনুভব করলাম জ্যাঠামশায়ের হাত। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন অঞ্জলির মানেটা কিছু বুঝেছো কি? আমার মুখে তখন নারকেল নাড়ুর অর্ধচর্বিত অবস্থা। জ্যাঠামশায় বললেন আমরা মায়ের রূপ গুণের ধ্যানমূর্তিকে ভক্তিভরে আবাহন করি আর প্রার্থনা করি আয়ু, আরোগ্য বিজয়, শান্তি ও মঙ্গলের ও সর্ব অশুভের বিনাশের। এখন এর বেশি নয়, অন্য সময় তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। না বুঝে শব্দ উচ্চারণ করা যুক্তি যুক্ত নয়।— এত সহজে ছাড়া পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি। মুখে নাড়ুর স্বাদটা যেন বেড়েই গেল। না বুঝে কিছু শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়— এই কথাটা ঐ বয়সে আমার সত্যিই ভালো লেগেছিল। জ্যাঠামশায়ের প্রতি নতুন শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তখন থেকে তাঁকে আর অনাবশ্যক জ্ঞানজর্জর শুষ্কমনস্ক প্রবীণ পুরুষ মাত্র মনে হয়নি। পরবর্তী প্রজন্মকে জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর বিশেষ আনন্দ। তাঁর জীবন ব্রত।

বহুকাল কেটে গেছে। জ্যাঠামশায়ের বয়সটা এখন আমি ধরে ফেলেছি। সম্প্রতি কালে তরুণ বয়স্কদের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ যখন ঘটে, স্নেহ যে নিম্নগামী, তার উপলব্ধিটা আসে তাৎক্ষণিক। আলাপান্তে তাদের জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও আশির্বাদ। মনের অজান্তে অন্তর থেকে অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হয় চরৈবেতি, চরৈবেতি— এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও, তোমরা নতুন যৌবনের দূত। অন্তরের অনুভূতিস্পর্শে হৃদয়ঙ্গম হয়, যে অতীত স্মৃতির রেশ আমার বর্তমান মানসিকতায় ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে ভাবী কালের কল্যাণ কামনায়। এইটাই বোধহয় ঐতিহ্য পরম্পরার স্বাভাবিক গতিপথ।

Two Lemons

Swagata Chakraborty

Meera is a smart, independent girl. After finishing her college and landing a job in the Corporate sector she was enjoying her new responsibilities. Although her parents were very happy to see their daughter slowly walking towards the path of success, like any other Indian parents, they were desperate for her marriage.

Things moved quickly and just after completing her first year in job, she got married to Vineet, a Mechanical Engineer working at a Government firm in New Delhi. Then came the time when she had to leave her city. Meera was not quite happy but it seemed to be the only option available. She requested her company to consider a transfer, but it didn't work out and she had to resign from her current job and moved to Delhi.

Vineet grew up in a joint family but had to take up his job in New Delhi. He had his apartment provided by his office. The arrangement was perfect for him as a bachelor as the apartment was very close to his work location.

After a week of their marriage, Vineet and Meera left for Delhi but decided to stay with Vineet's family in their ancestral home for a while. Vineet thought that it would be nice for Meera to stay with the family so that she would not feel alone while Vineet was at work.

Vineet received the changes as it came and didn't mind the extra commuting hours to reach his office. But the situation was a bit different for Meera. Meera accepted the new changes in her life and started keeping herself busy doing the daily chores and taking care of her new family members but deep inside, she wanted to go back to her old life and be independent again.

It was a nice few months, but things started to change. On a warm Monday, while Vineet was in office and all other family members gathered to have lunch together, Meera asked her mother-in-law if there was any lemon in the fridge. Her mother in law replied that they would not buy lemons as most of them had acidity problems and Vineet especially hates it and she continued her story.

When Vineet was a boy, one day he ate his lunch and squeezed some lemon wedges into his curries. Once he finished his lunch, he was having nausea. He soon vomited out his entire meal and was feeling very dizzy. Doctor was called, and it was found that Vineet had chronic acid reflux. Doctor advised Vineet to avoid warm milk, lemon, or lime etc. From that day, Vineet never touched another lemon although he was very happy that he could get rid of drinking a glass of milk every day after coming back from school.

As the story finished Meera's mother-in-law laughed and made sure no one brings this topic anymore. Meera couldn't say to her that she really loved lemon and her meals wouldn't be complete without one. But she chose to remain silent.

As time progressed, Meera started taking care of Vineet's family and most of the household work. Vineet, too was working hard in his office. He had long office hours as his travel time had also added up but when he would come back home in the late evenings, Meera always had a smile on her face.

Vineet was always a shy person when it came to speaking about what he really liked in Meera and the qualities he really admired about her. Meera was outspoken but she also kept her feelings to herself when she was not hearing much from the other side. Meera would try out new recipes for Vineet and cook according to his likes or dislikes. She couldn't do much at her will like a newlywed couple as she was living with all the other family members, but she was happy as she was always receiving love and affection specially from Vineet's grandparents.

Everyday Meera woke up early and packed Vineet's lunch and prepared her favorite ginger lemon tea without a lemon and spent some "Me Time" doing Yoga on the terrace. On weekends, Meera would go to the market with Vineet for groceries. Sometimes, they would go for a movie or to a café. Those were the only private time they spent with each other outside home. Meera adapted her life to make others happy. She also tried to be happy by seeing other happy faces around her. And the family members were happy and adored her for her caring nature.

Two years passed by. On a Friday evening, Vineet announced at dinner that his company had promoted him but also transferred him to a new city, Mumbai. It was a happy and sad moment for everyone. Meera didn't say anything but was excited in her heart as this would give her an opportunity to be close to her parents.

Meera and Vineet moved to Mumbai and slowly adjusted in their new apartment. They went to visit Meera's parents in Pune after a long time. A new city, a new breath of air and a new thought. Meera started preparing herself to start working again. Vineet was also encouraging. She started working hard to face job interviews.

Few weeks passed. On one Monday, Meera woke up and didn't find Vineet in the room. She went to the kitchen to prepare her morning tea and found a bag full of groceries. She thought Vineet must have left for his early morning stroll and got those groceries from a nearby market as she had prepared the list last night.

She decided to sort those groceries first and then make tea. As she was taking out the contents one by one, she saw a brown paper bag and 2 oval shaped yellow things. She jumped off with excitement. She could not believe what she was seeing. Her favorite pair of lemons. Immediately she prepared her favorite tea, this time with lemon. She also enjoyed the rest of her meals with those fresh and juicy lemons.

She suddenly realized that her feelings were not anymore one sided. The bond of friendship, love and care were now mutual. She strongly believed that Love can be expressed without words and here, 2 lemons did that.

অভয়া শক্তি বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো

শারদীয়ার হার্দিক শুভেচ্ছাসহ

সুজাতা মিএ,

সন্ধ্যা, লক্ষীনারায়ণ, দেবলীনা,

সুদেষ্ণা, দেবব্রত ঘোষ

পাহাড় থেকে শিক্ষা

মিতালী দাস সিং

জীবনের যাবতীয় শিক্ষা আমরা নানান ভাবে পেয়ে থাকি।আমাদের প্রথম শিক্ষাগুরু হলেন বাবা, মা, দাদা, দিদি, স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা, আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী এবং আরো অনেকে। আমরা নিজেরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। আমার জীবনের অতি মূল্যবান কিছু শিক্ষা আমি পাহাড় থেকে পেয়েছি। এখানে তারই কিছু কাহিনী শোনাবো।

1995 এর August মাসে আমি প্রথম পর্বতারোহণ অভিযানে যাই 'সাঁতরাগাছি শৈলসাথী ' র একজন সদস্য হিসেবে। তার আগে আমার পাহাড়ে যাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার সেই সময়ের তিনজন সহকর্মী ছিলেন যাদের জীবনের অন্যতম নেশা ছিল পাহাড়। তাদের কাছেই পাহাড়ের গল্প শুনে, ছবি এবং ভিডিও দেখে আমার আগ্রহ জাগে এবং তারাই আমায় উৎসাহ দেয় অভিযানে যাওয়ার জন্য।

আমার এক সহকর্মী ও অভিযান সহযাত্রী গোপালের বাড়ি গিয়ে যখন রুকস্যাক প্যাক করছি, তখন তাতে তিনখানা চুড়িদার সেট রেখেছিলাম কারণ ফেরার সময় তিনদিন আমরা হরিদ্বারে কাটাবো। আমায় গোপাল বললো 'এতো গুলো জামা নিয়ে কি করবেন? মনে রাখবেন, একটা সময় আসবে যখন একটা সূঁচের ওজনও বেশি মনে হবে'। তার কথা অনুযায়ী এক সেট চুড়িদার নিয়েই যাত্রা শুরু করলাম। গঙ্গোত্রী থেকে যখন আমরা পায়ে হেঁটে বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম, তখনই গোপালের কথা অদ্ভুত ভাবে মিলে গেলো। জিনিসপত্র সহ এক একটা রুকস্যাকের ওজন 20-22 কেজি বা তার থেকেও একটু বেশি হতো, সেই রুকস্যাক নিয়ে যখন পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটছি, তখন বুঝতে পারলাম গোপালের উপদেশ কতখানি কাজে লেগেছে। সেই দিন থেকে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে কোথাও বেড়াতে গেলে Minimum জিনিস নিয়ে যাওয়া। শুধু ভ্রমণই নয়, তারপর থেকে অনুভব করতে শুরু করলাম আমি নিজের জীবনে ও একজন Minimalist হয়ে গিয়েছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছুই আর আমায় আনন্দ দেয় না, যদি ও প্রত্যেকের কাছে প্রয়োজনের সংজ্ঞাটা আলাদা।

গাড়োয়াল হিমালয়ের থেলু এবং কোটেশ্বর পর্বতশৃঙ্গে ছিল আমাদের প্রথম অভিযান। তার বেস ক্যাম্প এর সম্মুখপানে দেখা যেত শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ। উষালগ্নে যখন সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি শুরু হতো তখন থেকেই শিবলিঙ্গ শৃঙ্গে শুরু হয়ে যেত সোনালি রঙের আভার আনাগোনা। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সেই আভা বাড়তে বাড়তে শৃঙ্গের উপরের অংশ সোনালি আভায় ভরে যেত আর সেই অপরূপ দৃশ্য মনের মধ্যে এক স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দিত। মনে হতো এই দৃশ্য দেখার পর পর্বতে আরোহন বা অবরোহণ করতে গিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাহলেও কোনো অনুশোচনা থাকবে না। যারা হিমালয়ে গেছেন পর্বতশৃঙ্গ আরোহন করতে, তারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। সেইদিন থেকে উপলব্ধি

করেছি মৃত্যু আমার কাছে কোনো ভীতিজনক ঘটনা নয়। একদিন আমাদের সকলকেই এই জগৎ সংসার ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু সেই চলে যাওয়ার পিছনে যেন কোনো ভয় কাজ না করে। করোনা এসে আমার পরমাত্মীয় দের কেড়ে নিয়ে গেলো, হারালাম আরো অনেক কাছের লোকজনদের। তাদের চলে যাওয়ায় খুবই ব্যথিত হলাম কিন্তু নিজের চলে যাওয়ার সময় মৃত্যু কখনও ভয় দেখাতে পারবে না।

Avalanche এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয় পাহাড়ে গিয়ে, তার আগে পেপারে বা বই পড়ে জেনেছি Avalanche এর স্বরূপ। হিমালয়ে গিয়ে যখন রাতের অন্ধকারে তাঁবুতে ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যেত ভয়ঙ্কর শব্দে, মনে হতো যেন তাঁবুর বাইরে বাজ পড়েছে। সারা শরীর আতঙ্কে কাঁপতে থাকতো। এরই মধ্যে আমাদের টিম মেম্বার প্রদীপ একদিন রোপ লাগিয়ে আরোহন করতে গিয়ে 6 ইঞ্চি দূরে তুষারধ্বসের মুখোমুখি হয়। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় সে ঐ যাত্রায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে।

উপলব্ধি করলাম আমাদের জীবন কতখানি অনিশ্চয়তায় ভরা। মুহূর্তের মধ্যে আমরা পরপারে পাড়ি দিতে পারি। তাহলে কি লাভ দৈনন্দিন জীবনে ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, চেনাজানা লোকজনের সাথে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, মারামারিতে জড়িয়ে! নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে মহান বা ক্ষমতাশালী দেখানোর চেষ্টা করেই বা কি হবে! এমনকি পার্থিব ধনসম্পদ নিয়ে নিজের ভাই-বোনের সাথে ঝগড়া-বিবাদ, সম্পর্ক নষ্ট, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মামলা-মোকদ্দমা এবং চূড়ান্ত লোভের প্রতারণায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া সবই অর্থহীন, যদি জানি যে জীবনের Avalanche যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর হানা দিতে পারে। এই অনুভূতির পর পার্থিব জিনিসপত্রের প্রতি লোভ আমার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাটিতে জড়িয়ে কোনো আনন্দ পাই না। যদি কারো কোনো আচার-আচরণ বা কথাবার্তা আমার মনোমত না হয়, তাহলে তা যেন আমার হৃদয়ে স্পর্শ না করে, সেই চেষ্টাই করে যাবো আজীবন। পাহাড় থেকে পাওয়া এই শিক্ষা আমার জীবনে সমস্ত রকম প্রতিকূল আবহাওয়া দূর করে দিয়েছে।

পাহাড় আমায় আরো অনেক অনেক শিক্ষা দিয়েছে, যা আমার মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তুলতে অনেক সাহায্য করেছে। অ্যাডভেঞ্চার এখন আমার খুব প্রিয়, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাও তুলনাহীন। এইভাবেই সারা জীবন আমি পাহাড়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

সঠিক নাম জানি না

তিতাস মাহমুদ

আজ আমাদের বাড়িতে গোটা দশেক পরিবারকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। গতরাত থেকে রান্নাবান্নাসহ যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। শৈশব থেকে জেনে এসেছি, বাড়িতে অতিথি মানে সংসারের লক্ষ্মী আসা। স্বয়ং ঈশ্বর কখনো কখনো অতিথির রূপ ধরে বাড়িতে আসেন। এখন অবশ্য যুগ পাল্টেছে। শুধু আমেরিকায় কেন, দেশেও আজকাল আচানক বলা কওয়া ছাড়া অসময়ের অতিথি বাড়িতে আসেন না। এই অতি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে নেমন্তন্ন ছাড়া কারো বাড়িতে যাওয়ার অর্থ, অনেক অর্থেই অভদ্রতা বা অসভ্যতা। এদেশে অতিথিরা নির্ধারিত সময় মোতাবেক হাতে যথেষ্ট উপহার সামগ্রী নিয়ে তবেই গৃহে প্রবেশ করেন। অতিথিদের সামনে বহু পদের খাবার-দাবার সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করা হয়। এসব লৌকিকতায় ঈশ্বর কোথায়; আমি কেবল দ্বিপদী সভ্যভব্য সামাজিক কিছু মানুষ দেখি।

আমাকে এক দৌড়ে বাড়ির পাশে বড় বাজারে আসতে হলো। ফ্রিজ খুলে দেখা গেলো লেবু, ধনেপাতা, কাঁচা শশা, টক দই নেই। শেষ মুহূর্তের কিছু সওদা কিনতে হবে। গাড়ি থেকে নেমেই ছুট দিলাম দোকানের ভেতর। হাতে ধরা লিস্ট ধরে যা কিছু ছিলো, টুপটাপ চটজলদি ট্রলিতে নিলাম। সাথে চারটে দুই লিটারের হাল্কা পানীয় আর একগুচ্ছ তাজাফুলও নিলাম। কাউন্টারে পয়সা দেবো, দেখি সেখানে লম্বা লাইন। অস্থির হয়ে এদিক সেদিক দেখছি। অন্য কোনও কাউন্টার খোলা থাকলে হয়তো দ্রুত হতো। সে আশায় গুড়েবালি! আজ শনিবার; সবাই এসেছেন সাপ্তাহিক বাজারে। সবার ট্রলিভর্তি নানারকম মালামাল। এদিকে দুশ্চিন্তা বাড়ছে আমার। আমি বারবার হাতঘড়িটা দেখছিলাম। মানসিক অস্থিরতা আঁচ করে আমার সামনে দাঁড়ানো একজন বলে উঠলেন, ‘ আরে! এতো কম সওদা তোমার। তোমার তো সময়-ই লাগবে না। এসো, তুমি আমার সামনে চলে এসো।’ এভাবে আরো দু’জন আমাকে তাদের আগে জায়গা ছেড়ে দিলেন। আমি অসীম কৃতজ্ঞতায় তাঁদের ধন্যবাদ দিলাম।

কাউন্টারে ক্যাশিয়ার ছেলেটি অল্প বয়েসি। আমার বড় ছেলের চাইতে বছর খানেকের ছোট। দেখে বোঝা যায়, সে মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া যুবক। ওর বা’হাতটা খানিকটা সরু। হিসেব-নিকেশে সে অন্যান্যদের মতো তেমন চটপটে নয়। ওর ধীর গতির জন্যে মানুষজনের বিলম্ব হচ্ছে। সেটা অবশ সে বুঝতে পারে। ছেলেটি তাই মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চাইছে, ‘সরি, ফর দ্য লং ওয়েট।’ আমার সামনের ভদ্রমহিলার পয়সা দেওয়া শেষ। তিনি এক এক করে তাঁর কেনা সওদাগুলো গুছিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগগুলোতে ভরে নিচ্ছেন। এসব গোছগাছের ফাঁকে তিনি ছেলেটিকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যালো জিম, আমি যদি এই ব্যাগটা তোমার জন্যে রেখে যাই, তোমার কী কোন সমস্যা হবে?’ ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললো, ‘ তা হবে কেন? সব দাম তো তুমি দিলে; এ সব কিছুই তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস।' ভদ্রমহিলা আর কোনো কথা না বলে

একটি ব্যাগ জিমের হাতে তুলে দিলেন। এরপর ধীর গতিতে ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

এবার আমার পালা। জিমকে ' হ্যালো ' বলে আমি ঝটপট পয়সা দিয়ে বেরিয়ে দিলাম। কিছুদিন বাদে দুর্গা পুজো। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণীকার জন্য ছোট্ট একটা লেখা দিতে হবে আমাকে। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে লেখালিখিতে আমি পারদর্শী নই। আমার তেমন ধর্মজ্ঞান নেই। তবে আমি মানুষ দেখতে ভালোবাসি। হাঁটাচলায় নানারকম মানুষ দেখি। আজকের মতো হঠাৎ আমি মাঝে মাঝে মানুষের ভেতরে দেবতা দেখতে পাই। তা সে দুর্গা হলে দুর্গা, ঈশ্বর হলে ঈশ্বর। আমি এঁদের সঠিক নাম জানি না।

শারদ সম্ভাষণ

উৎপল, শ্যামশ্রী ও ঊষসী দত্ত

Puja Greetings

Suman, Soma & Sumeet Chakravarti

KLEIN'S
SEAFOOD

330.773.1551 | KLEINSEAFOOD.COM
1072 GRANT ST. AKRON, OHIO 44311

RETAIL HOURS
TUES - SAT 10:00 AM - 6:00 PM
FRIDAY 10:00 AM - 6:30 PM
CARRYOUT HOURS
TUES - SAT 11:00 AM - 5:45 PM
FRIDAY 11:00 AM - 6:15 PM

FAMILY OWNED SINCE '34

Puja Greetings!

Abhijeet, Moonmoon, Ayan, Olivia

কাছের মানুষ স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বপ্না ব্যানার্জী

সম্প্রতি Facebook এর পাতায় দেখলাম কেউ একজন রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশতম President স্বর্গীয় স্বামী ভূতেশানন্দের একটি ছবির নিচে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন – খুব সম্ভবত তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। তার উত্তরে দেখলাম চেনা ও অচেনা আরও বহুলোক ওঁকে প্রণাম জানিয়েছেন। ছবিটি দেখে আমার ছোটবেলার অনেক পুরোনো স্মৃতি মনে ভেসে এল। মনে পড়ল এই পরমশ্রদ্ধেয় মানুষটির কত কাছে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

Cleveland এ আমার পরিচিত একজন শুনেছিলাম স্বামিজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁকে একবার আমাকে লেখা ওঁর একটা চিঠি দেখিয়েছিলাম। তিনি চিঠিটি নিয়ে খুব ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন মনে আছে। ঠিক এই ধরণের গুরুশিষ্যের সম্পর্ক কিন্তু আমার সঙ্গে স্বামিজীর ছিল না – আমি ছোটবেলা থেকে ওঁকে খুব প্রিয় একজন কাছের মানুষ বলেই জানতাম। ছোটবেলায় খুব ধার্মিক পরিবেশে বড় হই নি। আমাদের বাড়িতে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া বা কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া এসবের প্রচলন ছিল না। আমার মা তাঁর লক্ষ্মীর আসনে রোজ জল দিতেন এবং বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়তেন। এছাড়াও বাৎসরিক কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো, সরস্বতী পুজো ও শিবরাত্রির উপোস পালন করার কথা মনে পড়ে। আমার বাবা তো এসব কিছুই মানতেন না। দৈবাৎ যদি মা'র পুরোহিতের দরকার পড়ত তখন বাবা drawer খুলে একটি পৈতে বের করে মার পুজো করে দিতেন।

স্বামিজীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের প্রথম পরিচয় হয় প্রবাসী বাঙ্গালী হিসেবে। ১৯৪৫ সালে উনি রাজকোট শহরের রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনা করতে গুজরাতে আসেন। বাবা তখন রাজকোটের কাছে মোরভী বলে একটি খুব ছোট্ট শহরের Engineering College এর principal হিসেবে কাজ করতেন। রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মানুযায়ী যে শহরে মঠের নিজেদের কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকে, সেখানে তাঁরা কোনও গৃহীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। তাই মোরভীতে মঠের কোনও কাজে এলে স্বামিজী আমাদের বাড়িতে এসে থাকতেন। ওই অঞ্চলে তখন ধারেকাছে আর কোনও বাঙালি পরিবার ছিল না। এসবই অবশ্য আমার জন্মের আগেকার কথা। আমাদের ভাইবোনেদের কোনও ধারণাই ছিল না যে উনি একজন কতবড় বিদগ্ধ মানুষ, আমরা ওঁকে এক বয়োজ্যেষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই জানতাম। সেই জনবিরল জায়গায় আমাদর বাড়িতে খুবই কদাচিৎ কোনও অতিথির সমাগম হত, বাঙালি তো নয়ই। আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম উনি আবার কবে আসবেন। এইরকম অমায়িক, বিনয়ী মানুষ আমি আর কখনও দেখি নি। বড় হয়ে একটি চানক্য শ্লোক পড়েছিলাম, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম"।

উনি ছিলেন তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। আমরা উনি ঢুকলেই তাঁর হাত ধরে ঝুলে পড়তাম, উনি হাসিমুখে আমাদের সব অত্যাচার সহ্য করতেন। আমরা সবাই ওঁকে স্বামিজী বলেই ডাকতাম, যদিও উনি একবার মাকে বলেছিলেন যে ওঁরা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকেই "স্বামিজী" বলে সম্বোধন করেন, আর রামকৃষ্ণ দেবকে ডাকেন "ঠাকুর" বলেন। অন্য সব সন্ন্যাসীদের "মহারাজ" বলে ডাকা হয়। উনি আমার বাবাকে "নরেশবাবু" বলে ডাকতেন আর মাকে ডাকতেন "মা সুলতা" বলে। আমাদের তিন ভাই বোনকে ডাকতেন আমাদের ডাকনাম কিনু, খোকন ও সপা বলে। কিনু, অর্থাৎ আমার দিদি ছিল ওঁর খুব স্নেহের পাত্রী। দিদিকে উনি সংস্কৃত পড়াতেন। ওঁর নাকি খুব ইচ্ছে ছিল দিদি matriculation এর পর সংস্কৃত নিয়ে পড়ে, তাই খুব আশাহত হয়েছিলেন দিদি বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে ঠিক করায়।

ওঁর সঙ্গে ছোটবেলার কাটানো দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। স্বামিজী বোধহয় তখন সবে পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েছেন, কিন্তু তখনই তাঁর দাঁতগুলো সব বাঁধানো ছিল। রাত্রিবেলা শোবার সময় পাশের টেবিলে একটি বাটিতে ওঁর দাঁতের পাটি জলে ডুবিয়ে রাখতেন। আমার আর আমার দাদার কাছে সেটা ছিল এক দারুণ কৌতুকের ব্যাপার। স্বামিজীর মুখে সবসময়ই একটু মুচকি হাসি লেগে থাকত, আর কথা যখন বলতেন তখন সে দাঁতের পাটিদুটো নড়াচড়া করত। একবার ওঁর মনোরঞ্জনের জন্য দিদি একটি নাটকের ব্যবস্থা করল। কাপড় টাঙ্গিয়ে stage তৈরি হল। নাটকের অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র আমরা তিনজন ভাইবোন – তাদের মধ্যে একজন আবার ভাল করে কথাই বলতে পারে না। শুনেছি স্বামিজী খুব মনোযোগ দিয়ে নাটকটি দেখেছিলেন এবং তার প্রশংসা করেছিলেন। এর অনেক বছর পরে একবার হাসিমুখে উনি কথাটা আবার তুলেছিলেন "কিনুর কিন্তু নাট্যপরিচালনায় অনেক talent ছিল। তিন অভিনেতা একের পর এক stage এ ঢুকলো এবং হিন্দীতে ঘোষণা করল, 'ম্যাঁয় রাজা হুঁ, ম্যাঁয় রানী হুঁ, ম্যাঁয় মন্ত্রী হুঁ,' এবং তারপরেই তারা ধুপ করে stage এ পড়ে গিয়ে দেহত্যাগ করল।

আমার মার আধ্যাত্মিক ব্যাপারে খুব কৌতূহল ছিল। স্বামিজী খুব ধৈর্য্য ধরে মার সঙ্গে সেসব আলোচনা করতেন এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে মার অগুন্তি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মার দৃঢ় ধারণা ছিল যে ওঁর কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। একবার সোজাসুজি ওঁকে সেই প্রশ্ন করাতে স্বামিজী নাকি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে করে বললেন "ঠাকুর আমাদের ওসব ব্যবহার করতে বারণ করে গিয়েছেন।" মা'র কাছে অনেকবার শুনেছি যে আমার যখন কয়েকমাস বয়স তখন আমার খুব খারাপ ধরণের জ্বর হয়। ছোট জায়গাতে ডাক্তার খুব সহজে পাওয়া যেত না। ডাক্তার আসার আগেই আমার শরীর নাকি ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মুখ নীল হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। সেইসময় নাকি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামিজী আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কথা কেউই জানত না। আমার মা আমার কাছে বসে কাঁদছিলেন সেই সময়। স্বামিজী নাকি স্থির গলায় বললেন "সুলতা মা, কেঁদো না। ও ভাল হয়ে যাবে।" এই বলে আমার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার অবস্থার অনেক উন্নতি দেখা গেল। বোধহয় এই অভিজ্ঞতার জন্যই আমার মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বামিজী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

আমরা এর পরে গুজরাত থেকে মধ্যপ্রদেশে চলে আসি এবং তারও পরে বাবা কলকাতায় কাজ নিয়ে আসেন। দিদি তার অনেক আগে থেকেই বম্বেতে পড়াশোনা করছে, আমার দাদা আর আমিও অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছি। স্বামিজী মঠের কাজে পুরো ভারতবর্ষ এবং তার বাইরেও ঘুরে বেড়াতেন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও দেখা খুব একটা হয়নি অনেকদিন। একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন মনে

আছে। আগের মতন অনেকটা সময় কাটালেন আমাদের সঙ্গে, মা'র হাতের রান্না খেলেন। খাবার পর আমাদের চেনা আর এক বাঙালি

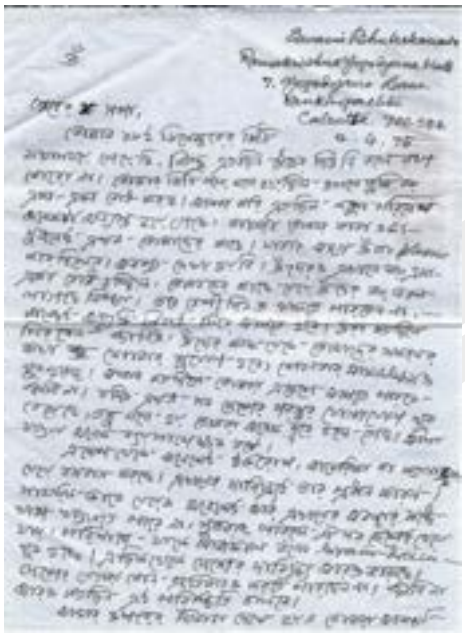

এদেশে আসার পর আমাকে লেখা প্রথম চিঠি

কথা বললেন, মুখে সেই স্মিত হাসি, কিন্তু আমার তখন এটা পরিষ্কার বোঝার বয়স হয়েছে যে উনি এখন অনেক উঁচু স্তরের

পরিবারের (যাঁদের সঙ্গে ওঁর রাজকোটে চেনা হয়েছিল) সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বললেন। আমার মা বললেন "ওদের বাড়ি খুব কাছে। আমিই আপনাকে রিক্সা করে নিয়ে যেতে পারব ।" স্বামিজী একটু চুপ করে বললেন "তাহলে দুটো রিক্সা ডাকো।" পরে জেনেছিলাম যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর ওঁরা একমাত্র জন্মদাত্রী মা ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোকের সাথে একাসনে বসতে পারেন না। ওঁর সঙ্গে আমাদের এত সহজ সম্পর্ক ছিল যে উনি যে একজন সন্ন্যাসী সেকথা আমাদের মনেই থাকত না। পুরোনো দিনের মত এক ঘরোয়া পরিবেশে স্বামিজীর সঙ্গে সেই বারই শেষ দেখা। এর কয়েকবছর পরে উনি আরেকবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর পদমর্যাদা তখন আরও অনেক উঁচুতে উঠেছে – তখন তিনি ওদের Board of Trustees র সদস্য। আমার বাবা তখন Central Government এর শিক্ষা বিভাগে Government grant এর charge এ ছিলেন। স্বামিজীর সঙ্গে আরও দু'তিনজন হোমরা চোমরা মহারাজ এসেছিলেন আমার বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের grant পাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে। ওঁরা এলেন দুটো চকচকে গাড়ি করে, সঙ্গে তিনচার জন সন্ন্যাসীর সাদা পোষাক পরা ব্রহ্মচারী ওঁদের পা রাখার টুল এগিয়ে দিচ্ছেন, জলের গ্লাস নিয়ে আসছেন। আমাদের বসার ঘর ভরে গেল। স্বামিজী আগের মতনই আমার সঙ্গে ডেকে বাসিন্দা, ওঁর সঙ্গে আর আগের মতন ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করা চলে না। এর ক'দিন পরেই স্বামিজী মঠের Vice President নির্বাচিত হন এবং কাঁকুরগাছির যোগোদ্যান মঠের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। আমার বাবার সঙ্গে কার্য্যসূত্রে বেলুড় মঠের Governing body র meeting এ ওঁর অনেকবার দেখা হলেও আমাদের বাড়িতে আমি থাকাকালীন উনি বোধহয় আর কখনও আসেন নি।

এর কয়েকছরের মধ্যেই আমি বিয়ে হয়ে আমেরিকায় চলে আসি। আমার মা, দিদি, ও দাদার সঙ্গে স্বামিজীর নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। আমার মা আমাকেও ওঁর ঠিকানা পাঠালেন। আমি ওঁকে চিঠি লিখতে ইতস্তত করছিলাম। আমার মতন একজন সামান্য মানুষ এত বিদগ্ধ, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাশালী এই মানুষটিকে কিই বা লিখতে পারব। কিন্তু সংকোচ ছাড়িয়ে যখন চিঠি পাঠালাম তখন তার উত্তর পেতে দেরি হল না। আমি যে বাবা মার জন্য মন খারাপ করে আছি উনি সেটা বুঝতে পেরে আমাকে কি সুন্দর সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন। এর পরেও আমার ওঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার চিঠির আদানপ্রদান হয়েছে। উনি আমাকে পড়াশোনা করার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছেন। সেইসময়

আমার দাদা এদেশে পড়াশোনা শেষ করে খুব অস্থিরমন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্বামিজী নিয়মিত ভাবে চিঠির মাধ্যমে ওকে সুপরামর্শ দিতেন। আমার দাদা বাংলা পড়তে পারে না, তাকে কি সুন্দর মুক্তাক্ষরে ইংরেজীতে চিঠি লিখতেন। দাদা দেশে ফিরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে যতবার দেখা করেছে উনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে আমার মাকে সেকথা জানিয়েছেন, কারণ উনি জানতেন যে মা ওর জন্য চিন্তা করছেন। স্বামিজীর এই সময় নিজের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু আমার মার অসুস্থতার খবর শুনেই মাকে খুব সুন্দর একটা চিঠি লিখেছিলেন। ওঁর এত কাজ, এত দায়িত্বপালনের মধ্যে কি করে যে উনি এত চিঠি লেখার সময় পেতেন জানি না।

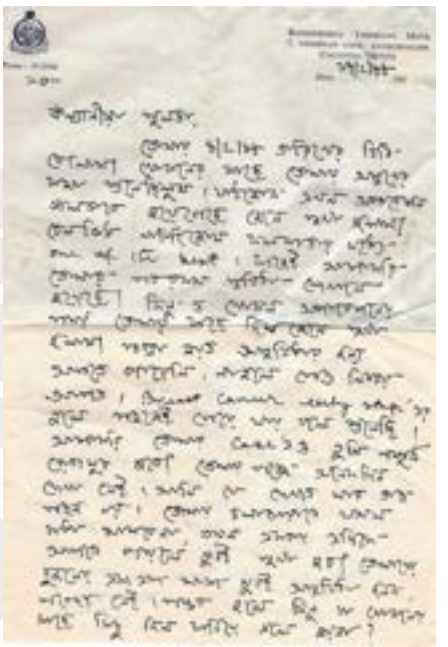

আমার মাকে লেখা চিঠির অংশ

এর পরে বহুদিন আমার সঙ্গে আর ওঁর দেখা হয় নি। আমি দেশে গেলেও খুব কম সময়ের জন্য যেতাম। আমার মাও অত দূরে বেলুড়ে বা কাঁকুরগাছিতে আমাকে নিয়ে যাবার সুযোগ পান নি। একবার বেলুড় মঠে ওঁর একটি lecture আছে শুনে মা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেল আমার দুই শিশুপুত্র। সেখানে গিয়ে দেখি জনে জনারণ্য। খোলা মাঠে ঘাসের ওপরে কয়েকশ লোক ওঁর আসার অপেক্ষায় বসে আছে। অনেক দূরে মঞ্চের ওপরে স্বামিজীর বসার জায়গা। আমার ছেলেরা একসঙ্গে এত লোক কখনও দেখে নি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বড়জন দিদিমার কোলে গিয়ে বসল, আর ছোটজন আমার সামনে পা ছড়িয়ে বসে আঙ্গুল চুষতে শুরু করল। হঠাৎ মঠের একজন কর্মী খুব রাগত মুখে আমার কাছে এসে বললেন "বাচ্চাকে পা গুটিয়ে বসতে বলুন। দেখছেন না পা দুটো মহারাজের দিকে তাক করে আছে?" আমি তো অবাক। দু'বছরের শিশু, সে কখনও পা গুটিয়ে বসতে শেখে নি। খুব আপত্তি জানাতে লাগল। লোকে আমাদের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কোলে নিয়ে বসলাম যাতে পা ছড়াতে না পারে এবং আঁচল দিয়ে ওর পা ঢেকে দিলাম। অন্ধ ভক্তি যে মানুষকে কতটা যুক্তিহীন করে দিতে পারে তা অনুভব করলাম। সেদিন স্বামিজীর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত দেখা করতে পেরেছিলাম কিনা আজ আর তা মনে নেই।

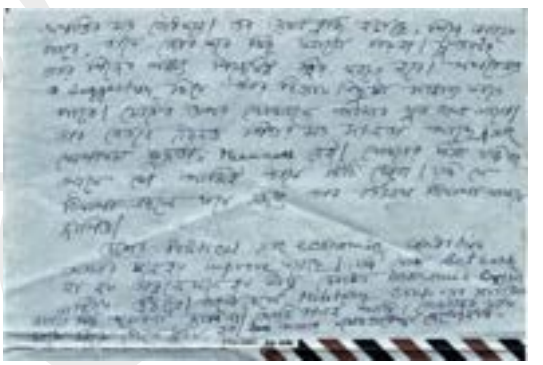

আমাকে লেখা আর একটা চিঠি

স্বামিজীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় এর আট নয় বছর পরে। এবারেও আমার মা আমাকে নিয়ে গেলেন। স্বামিজী তার আগের বছর রামকৃষ্ণ মঠের দ্বাদশতম

President নির্বাচিত হয়েছেন। অগত্যা তাঁর সঙ্গে দেখা করা আরও দুরূহ ব্যাপার। দর্শনের জন্য বিরাট লম্বা লাইন। Airport এর মত দড়ি দিয়ে সাপের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দাঁড় করিয়েছে। দেখে মনে হল না এযাত্রায় আর দেখা হবে। অনেক দূরে মঞ্চের ওপর সিংহাসনের মতন একটি আসনে স্বামিজী বসে আছেন। কাউকে ওঁর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সবাই তাঁর সামনে সিঁড়ির ওপরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন কাছাকাছি এসেছি তখন হঠাৎ স্বামিজী আমাদের দেখতে পেয়ে খুব জোর গলায় বলে উঠলেন "আরে সপা, তুমি কবে এলে? তুমি শুনলাম এখন পড়াতে শুরু করেছ? কিনুও তো পড়ায়, তোমরা কে বেশি মাইনে পাও?" সবাই আমাদের দিকে তাকালো। আমি খুব লজ্জা পেয়ে আস্তে আস্তে বললাম "দিদিই অনেক বেশি পায়। আমি তো part time পড়াই।" ওঁর কথাতে একটা ফল হল। ওদের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে line ভেঙে আমাদের ওঁর কাছে মঞ্চের একেবারে ওপরে নিয়ে গেল। উনি বোধহয় সেটা জানতেন বলেই আমাদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলেছিলেন। এই মৃদুভাষী মানুষটিকে জোরে কথা বলতে আগে কখনও শুনি নি। আমি খুব অপ্রস্তুত হলেও এটা বুঝতে পারলাম যে এ না হলে সেদিন ওঁর সঙ্গে হয়ত দেখাই হত না। সেই শেষবার ওঁকে প্রণাম করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এরপরেই শুনেছি স্বামিজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। জানিনা মার সঙ্গে ওঁর আর দেখা হয়েছিল কিনা। ১৯৯৮ সালে ৯৭ বছর বয়সে ওঁর মৃত্যু হয়। আমি সে খবর তখন পাই নি কারণ তার পাঁচ ছদিন পরেই আমার মাও চলে যান। বেশ কিছুদিন পরে দিদির কাছে শুনেছিলাম যে স্বামিজী আর নেই। আজও আশ্চর্য্য লাগে এই ভেবে যে এই বিদগ্ধ, বিখ্যাত ধর্মাত্মা মানুষটি, যিনি কিনা অগুন্তি লোকের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন, তিনি কি করে আমাদের মত এক সাধারণ পরিবারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশতে পেরেছিলেন। এই অতি নম্র, বিনয়ী মানুষটি আমাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন না, কিন্তু খুবই শ্রদ্ধার, আদরের, কাছের মানুষ ছিলেন।

A Page from My Diary

Rajanya Bishi (11 years)

My journey as a fifth grader has come to an end, and I am ready to take on middle school. After that I would go to high school, college and then soon complete my education, but no matter how far I'll get in life, I will never forget my elementary years. I have great memories of when I was in elementary school. I had so many friends and very nice teachers, and now that I am going to a new school district, I am sad to leave behind my elementary years. Not only were they golden moments in my life but also something to look back on in the future. So even though I was ready to start middle school, I wasn't ready to forget my special elementary moments.

My elementary years were very exciting. There was so much fun and excitement and less work. First, in first grade, my class went to our principal's house and we did lots of things. We went fishing in his pond, ziplined in his backyard, roasted s'mores at a campfire and played great games! Another fun time I had at my old school was going to the National History Museum on a field trip! We saw lots of different things like old weapons, dinosaur bones and we got to eat lunch there too! Thirdly, every September we would have to run 50 laps in our school's field for a fun run. Me and my friends ran together and every year we would try to run without stopping but we never reached that goal, we were frustrated then but now when I see my friends, we laugh about it. Overall, the fun run was another great moment.

When I was in fourth grade, I was in a chess club and we met every Monday after school. One of the school staff taught us and his brother sometimes came too. My favorite part was playing chess with my friends even if I lost the game. Lastly, the most memorable moment was when I entered an Arbor Day program competition and won along with my two other friends. The principal took us to a stadium in Cleveland and we got to share what we entered for the program and after the buffet we went out for an ice cream treat!! These were some of the best moments I ever had, and I am sad to think they are over.

Since this year I'll be starting middle school – a new school in a new district, I'm actually very excited for that - just can't wait! I hear that there are lots of fun things and teamwork activities. There is Science Olympiad, extra-curricular activities, clubs, band, orchestra and so many more! I also think that the teachers are great and hope to get a good one. The fun thing about elementary is that there were not many assignments and work, but middle school means more responsibilities. In elementary there was less homework but in middle school that's the complete opposite. There is homework pressure, complicated subjects/topics, and more studying, but it's something I'm looking forward to experiencing even though it's hard.

Lastly, even with me being new to this district I hope to have fun and to never give up when things are tough. There will be lots of competition, but I am determined to not let that get into friendships I have made. Instead of racing against each other, I think we should all help each other and accept when one of us has a better way to do something. I just don't want the competition to ruin friendships, because I believe everyone should have fun whether they are in elementary school or middle school.

I couldn't be more excited to go to middle school especially with so many new friends. My elementary years may have been just through grades one to five, but they have taught me what I need to know to do well. I am determined to make this a great year and do my best even if I sometimes might not succeed. I learnt that you must push yourself out there and keep on giving your best because, "wisdom isn't about how much you know, it's about how much you're willing to learn."

সবাইকে শারদীয় অভিনন্দন

সৌমিত্র, মুক্তা, সোহন ও শালীন

সকলের পুজো সুস্থ ও সুন্দর কাটুক।

~ শুভেচ্ছা সহ

নীলাঞ্জনা, সুদীপ্ত,

নন্দনা এবং অদ্রি

মাতঃ,

"অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ" -

সবাইকে জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা।

- উর্বী, স্টিভেন,

বৈশাখী ও জহর

শুভ শারদীয়া

Wish you all a HAPPY BIJOYA

Aaditya, Monika, Anika and Deep Samanta

ছায়ানট তুমি

বর্ষণজিৎ মজুমদার

ছিলোনা তোমার বলিউডি ছাপ বংশ,
বসরাই ছিলে মেকি গোলাপের দলে,
জাহাজ কে ধরে রাখে না তো বন্দর,
শান্ত চোখেই ইরফান ঝড় তোলে।

কাট !! কাট !! নেই, সব শট গুলো OK,
অচেনা তারার শুটিং স্পটেতে থেকো,
আকাশ লিখেছে তোমার চিত্রনাট্য ,
মেঘের ইজেলে সিনেমার ছবি এঁকো।

"নেমসেক" থেকে গোগোলের হাত ছেড়ে,
ছায়ানট আজ পথ হাঁটে একা একা,
"পিকু" দের দেখো আবার পাচ্ছে ক্ষিদে,
“লাঞ্চের বক্স” তবু পড়ে আছে ফাঁকা।

(অভিনেতা ইরফান খানের স্মৃতির সরণি বেয়ে)

ছায়াপাখি

ব্রতী ভট্টাচার্য

কষ্ট যখন ঢেউ এর মতো ওঠে নামে বুকের নিচে
একলা মেয়ে পানসি ভাসায়
যাকে খুব চিনবে ভেবে ঘর ছেড়েছে সেই যে কবেই
সে এখন খুব অচেনা,
মাথায় নিয়ে ফাঁকির বোঝা
বিষাদ মেয়ে পানসি ভাসায় কান্নাহাওয়ায়।

জানতো না সে ঢেউ-এর দেশে একটু পরেই প্রচন্ড ঝড়
পানসি যে তার ডুবে ভেসে আঁধার-আলোয় দিশেহারা।
উথাল পাথাল কষ্ট গুলো।
ডুবতে ডুবতে উতল মেয়ে
পায় যে খুঁজে জলের নীচেও আর এক আকাশ।

সেই আকাশে ছায়াপথে ছড়িয়ে আছে কতই ছবি
উদাস মেয়ে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে--
যেসব প্রহর ফসিল-মতো
ছেলেবেলার রান্নাবাটি
রাত বিরেতে পিতামহীর গল্প বলা আদর সুখের গরম চাদর
ক্ষীরের পুতুল, আংলা বুড়োর সেই যে অলস দুপুর গুলো পেয়ারা পাতার গন্ধ মাখে অবহেলায়।

বাবার গলায় রবি ঠাকুর, পালুস্কর আর মায়ের সাথে আবোল তাবোল সন্ধ্যাবেলায়।.

এসব কেমন গল্প কথা কেবল ভাবে সহজ মেয়ে ! কোথায় সবাই লুকিয়ে ছিল এই অজানায়?

চোখের পাতায় স্বপ্ন রেখে বুকের খাঁচায় উল্কি আঁকে অবাক মেয়ে

গভীর গোপন এই আকাশেই থাকবে হয়ে ছায়া পাখি ....

এইখানে তার সপ্ত রাজার এক মানিক এর অজানা ধন

ছায়া পথের এই সীমানায় এদের ঘিরেই চলবে উড়ে সারা জীবন।

আমাদের পরিচয়

মিতালী দাস সিং

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত জেলাশহর বাঁকুড়া—
এর লাল মাটিতে জন্ম আমার
বেড়ে ওঠা লেখাপড়া।
উড়োজাহাজ দেখে ছোটবেলায় ভাবিনি দুঃস্বপ্নে ,
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সে জগতের অন্যকোণে।
বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে
কেরালায় হলো ঠাঁই ,
খুঁজে বেড়াতাম কোথাও যদি
বাঙালির দেখা পাই।
সেখানে 'আমার পরিচয়' শুধু
আমি পশ্চিমবাংলার,
জন্মস্থান বাঁকুড়া তখনও
হৃদয়ে দখলদার।
একদিন পাড়ি দিতে হলো
সুদূর আমেরিকার উত্তরে,
কোনো ভারতীয় দেখামাত্র সেখানে
প্রেম উদ্বেল অন্তরে।
প্রশ্ন জাগে না কোন রাজ্যের-
বাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাট,
তামিলনাড়ু না মেঘালয়?
'আমরা ভারতীয়', সেটাই তখন
'আমাদের পরিচয়'।
কয়েক হাজার বছর পরে এমনও দিন
আসতে পারে,
আকাশগঙ্গার কোন এক গ্রহে হচ্ছে সেমিনার-
'মস্তিকা' গ্রহের অচেনা জীবের সঙ্গে হাজির
শুক্র, মঙ্গল আর পৃথিবীর
গুটিকয় পরিবার।
বাঁকুড়া, বাংলা ভারত ছাপিয়ে সেদিন 'বিশ্ব প্রতিনিধি'-
এভাবেই বদলে বদলে যাবে 'আমাদের পরিচয়'
চলমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিরবধি।

হারানো চিরকুট

সৌমেন ভট্টাচার্য

বান্ধবী, সেই অনেক চিঠির ভিড়ে
হারানো তোর পুরোনো চিরকুট -
খোঁজ নিতে তার আজও পারিনি রে,
ভাবতে বসে ভাবনারা দলছুট।

পড়লো মনে, যেদিন ছিলি পাশে,
জগৎ ছিল হাতের মুঠোয় ধরা !
পা দুটো তোর মিশতো সবুজ ঘাসে,
স্বপ্নালু চোখ আকাশ দিয়ে ভরা।

মেঘ ছিল সেই অথৈ আকাশ জুড়ে।
ঝড়ের ছোঁওয়ায় দামাল কাশের ফুল।
বাগেশ্রী তান জড়িয়েছিল সুরে,
মুখ ঢেকে তোর ছড়িয়ে ছিল চুল।

বুঝিনি তোর হাসি ঠোঁটের কোণে,
খুঁজিনি তাই মুক্তো ঝিনুক দেখে।
আজকে যখন হাঁটি কাশের বনে
যাই হারিয়ে নিজেই নিজের থেকে।

বান্ধবী, আজ চিনতে পারিস যদি -
আশায় আশায় বাড়িয়ে আছি হাত।
তোর ছন্দেই স্রোত পেয়েছে নদী।
তোর ভাবনায় বিনিদ্র যায় রাত ॥

আবাহন

তানিয়া তালুকদার

মা আবার আসবেন বলে,

দুয়ার আমি রাখবো খুলে!

মায়ের পথে ফুল ছড়িয়ে

আনন্দে আজ মন ভরিয়ে

উল্লাস বাতাসে ছড়িয়ে

আমি নেবো মায়ে র আশির্বাদ।

বাজবে ঢাক, বাজবে শঙ্খ

উড়বে ধূপের মিষ্টি গন্ধ-

যখন দেখা দেবেন মা তাঁর সন্তানদের,

দীর্ঘ দিন পর।

A Theory of Everything
Jahar Haque

All four fundamental forces
Were believed to be
Shackled together
In a densely dark prison of
Singular symmetry
Before the birth of
The space-time continuum.
Then happened
The Big Bang
To break the symmetry
Unleashing all forces
Weak and strong.

And in an
Infinitesimally little while
Many fundamental particles
Came into being
And began
To dance and play
With the forces around
In accord with the laws
Of which the origin
Not known.

Such strange was
The beginning of

The Universe.
After a time immemorial
Evolved the world of
The living
Wherein
In course of time
Came the Homo sapiens
Of a Big Brain
Adept of curiously knowing
And appreciating
The profound beauty of
The Big Bang
A theory of everything
Unfolding the biggest mystery
In the creation of
Our Universe
That some say
Multiverse.

And, if so
Happened indeed,
Tell me
When our God
Got into the stage!

Dedicated to my physicist friend Dr. Anup Majumder on his 70th birthday

আমার তেমন ধর্মজ্ঞান নেই। আমি মানুষ দেখতে ভালোবাসি। হাঁটাচলায় নানারকম মানুষ দেখি। মাঝে মাঝে মানুষের ভেতরে দেবতা দেখতে পাই। তা সে দূর্গা হলে দূর্গা, ঈশ্বর হলে ঈশ্বর। আমি এঁদের সঠিক নাম জানি না।

তিতাস মাহমুদ

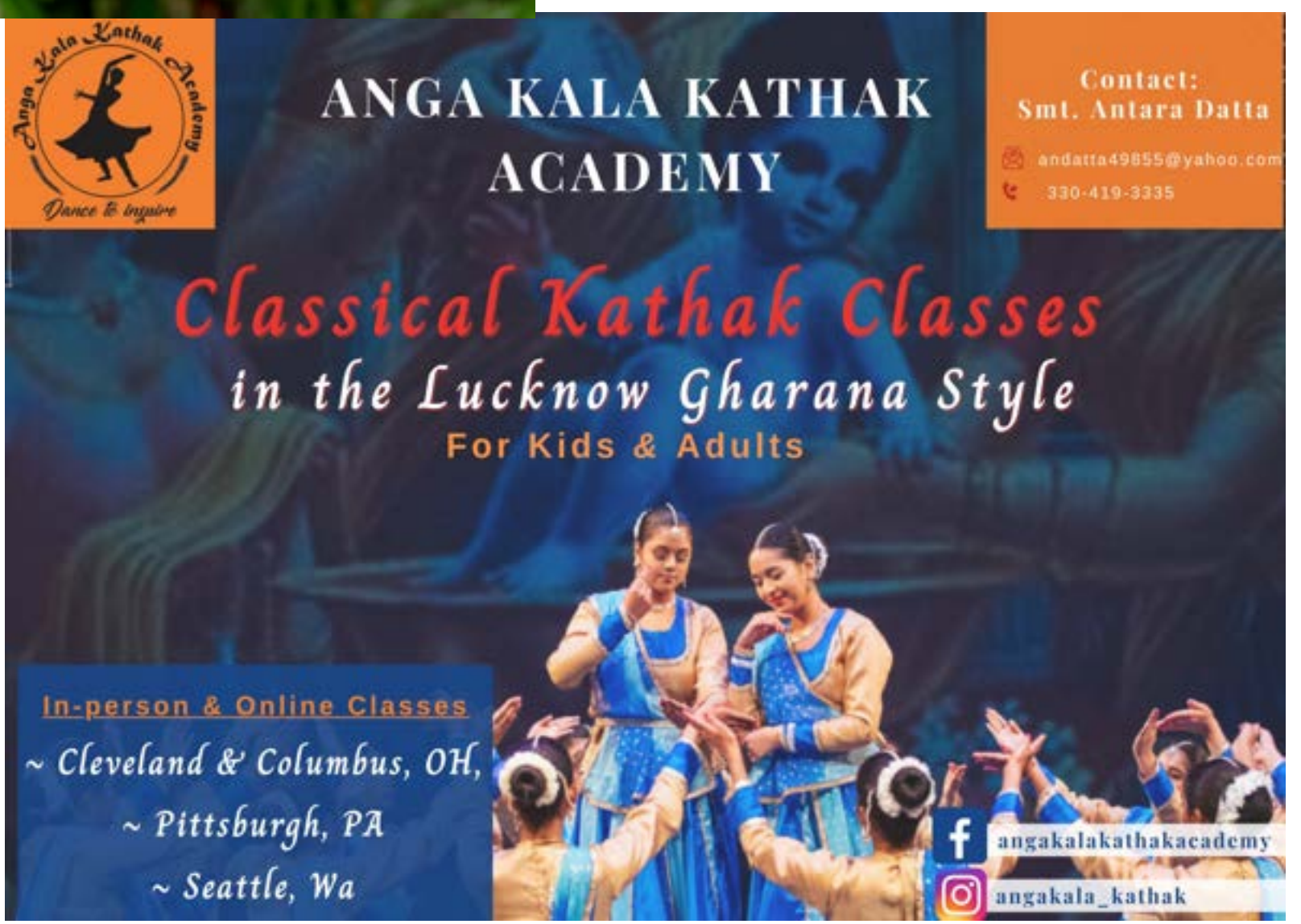

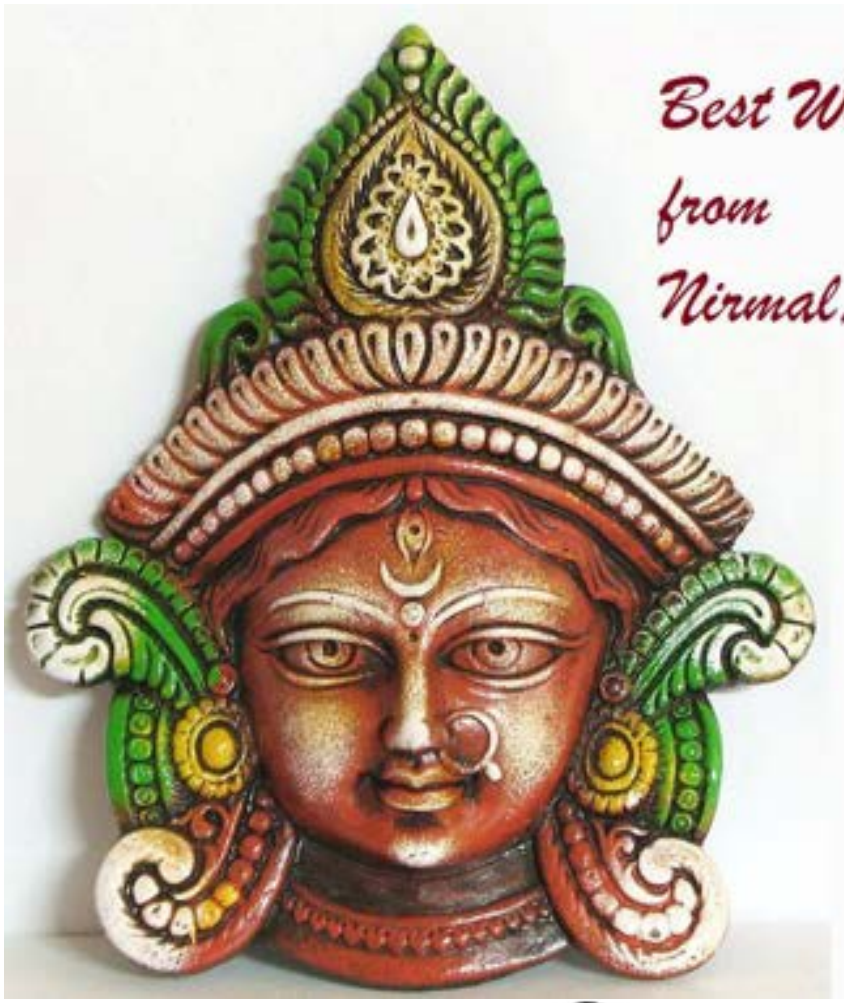

Best Wishes
from
Nirmal, Sunanda Kundu & Family

শারদীয়ার অভিনন্দন

শৌভিক | দেবপ্রিয়া | অনুষ্কা | অলীনা

WRAP TITE

"Your Source For Packaging, Shipping & Safety Supplies"

WE'RE HIRING

Here at Wrap Tite we collaborate, support each other and strive to improve. Our associates take tremendous pride in their chosen professions, the quality products we create and sell and the positive difference our company makes. Wrap Tite is a growing, stable employer with many career opportunities available. If you see yourself thriving in our culture, we want to talk to you.

WRAP TITE BENEFITS

- 401K after a year
- Health benefits after 90 days
- PTO starting after 90 days
- Room for company advancement
- Team work environment
- Tuition Reimbursement

At Wrap Tite, we are more than a workplace, We Are Family.
We hold ourselves to the highest standards, to do this we need top performers.

To view open positions or apply, visit www.wraptite.com/careers.html
Or stop in 6200 Cochran Rd. Solon, OH 44139 between 9a.m and 3p.m

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

রিয়া, অঞ্জলি, অরূপ , রুমা, অসিত

jaipurjunction

Home of the Indian delicacy

9249 W Sprague Rd. North Royalton, OH 44133

(440) 842-3555

LUNCH - Mon-Fri: 11.30 AM - 2.30 PM, Sat-Sun: 12.00 PM - 3.00 PM
DINNER - Mon-Sat: 5.00 PM - 10.00 PM, Sun: 5.00 PM - 9.00 PM

www.thejaipurjunction.com

BANQUET HALL

Can accommodate 75 people

Available for your parties - birthdays, anniversaries, graduation etc.

Best wishes & Bijoya Greetings

From Our Family

BAIKUNTHA, RATNA, KOUSHIK
MALA, ASHNA, PARTHA, RIMI,
PRISHA, DRISHAN

New York City Travel Log

Arjav Das (8th Grade)

It was a normal Friday, July 2nd of 2021 to be specific. However, it was very special to me, because that was the day I got to go to New York City. When I first heard we were going to NYC, I was thrilled, excited, and anxious. I also heard that we'd be going there via train, which got me even more excited, as it would be my first train ride. Throughout this travel log, I will be writing down my experience in the vast city of NYC.

Day 1

My eyes slowly opened as I woke up in my bed. It took me around 5 minutes to get out of bed, but as soon as I realized what was going on, I jumped out of bed and got on my feet. It was about 3 AM, so I ate a quick breakfast with my brother, then we grabbed our bags and went outside to catch the taxi. Once the taxi arrived, we loaded our bags and went on our way to the Amtrak station in downtown Cleveland, and as I looked around at the city by dawn's early light as the sun opened up on the horizon, I wondered how much better NYC would look. I imagined New York City as a large bustling area filled with enormous buildings, honking cars, and chattering people. The overall wait for the train was very dull, but we skipped everything you'd normally do at an airport, like the check-in, TSA check, etc. The train arrived around 6:45 AM, and we boarded the train. The train's interior looked very much like an airplane; however, it had more legroom, a dining area. I sat down in my comfortable seat and looked out into the window for a while. I played some games on my phone and listened to music before I took a nap for a while. Once I woke up, I continued to play some games on my phone. I stopped playing once we were near the city, and my jaw dropped after seeing all the tall buildings. We arrived at the NYC Penn Station shortly thereafter. We checked into a hotel in Midtown Manhattan. I

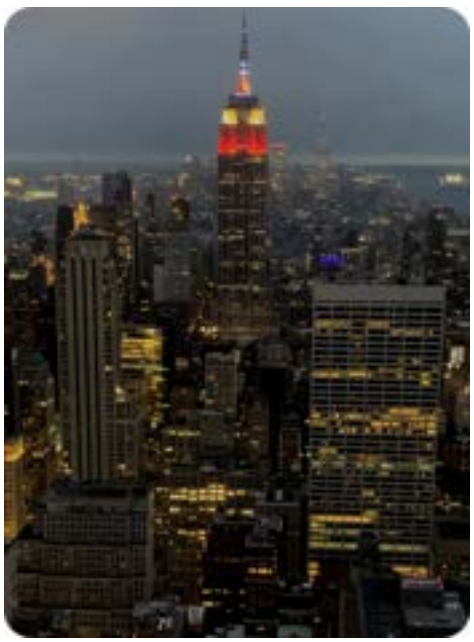

looked out the window and let my fledgling thoughts on NYC spread its wings!

Day 2

I was woken up in my bed by my parents. I walked crabbily to the bathroom as I brushed my teeth. I took shower and got dressed for the day and went to a cafe near our hotel called Cafe Metro. The NY-style breakfast I had in the cafe was very delicious. I'd say it was the best breakfast I've had in a while. Once we finished eating, we left the cafe and started our tour of the city. We first went to the Grand Central Station and took a look at the station's inside. Grand Central was opened to the public in 1913 on February 2nd. It's a famous landmark and a transportation hub in Manhattan. We ordered pizza in the dining area, it lived up to my expectations of New York-style pizza. After that, we went to Bryant Park and had some coffee. We then left to see the New York Public Library – an iconic building in NYC, made according to Beaux-Arts architectural style. However, luck did not favor us as the library was closed for the public due to pandemics. We, therefore, left to see Times Square. My heart pounded; my stomach held millions of butterflies. Finally, I was going to experience Times Square! Times Square was originally called Long Acre, and it served as the site for William H. Vanderbilt's horse exchange in the 1880s. We arrived at Times Square, and the first thing I saw was bright lights and numerous luminous billboards! There were five men doing stunt acts in front of a large crowd of people, which got my attention. All the lights, advertisements, buildings, honking horns, people in costumes, commotions, and hustling and bustling – these are the different fabrics that make Times Square the most famous crossroad in the world! After spending some time in Times Square, we went to the observation deck at the top of the Rockefeller Center - "Top of the Rock", which, so far, was the tallest building I've been in. We spent our time there watching the awe-inspiring view of New York City under the fading light of dusk until it got darker and glittering lights started intensifying from every skyscraper. It was captivating, astounding! I headed back to our hotel with dreamy eyes!

Day 3

Day 3 of our trip was special to us as it coincided with American Independence Day. We started the day off by eating breakfast at the same café and then took a bus tour around Manhattan, while we were still on the bus, my dad broke his glasses. We left his extra pair at the hotel so we had to go to a nearby pharmacy and taped his glasses back together. We weren't far from our destination, so we decided to take the subway instead. I was ecstatic as it would be my first time on a subway in NYC. The NYC Subway opened its first line on October 27, 1904, and since then, it has gotten billions of passengers. Once we

entered the station, we waited patiently for the subway. The station itself looked exactly like it does in the pictures you see of it online. After we waited for a short while, we boarded the subway. The flash of passing tunnel lights looked mysterious and surreal as if it was taken straight out of a horror film. We got off the subway once we arrived at our destination. We first visited the 9/11 memorial and paid our respects. The memorial is split into two sections, one for each tower - in the very spot where both towers once stood, is a cavernous pool with flowing water. On the concrete railings, the names of each person who lost their lives on the tragic day of 09/11/2001 are carved. After some time, we entered the One World Trade Center. It was finished on May 23rd, 2006, which was less than 5 years after the attacks on the Twin Towers. It is now the tallest building in New York City and the 6th tallest in the world. We had an opportunity to take a picture with police officers of the famously known NYPD. We went through a security checkpoint on the bottom floor, then we went to a mall – The Oculus, for lunch. The mall itself could be perceived as a futuristic building from a sci-fi film. Thereafter we went to the observatory on the top floor. We got a stunning 360-degree view of Manhattan and parts of the other boroughs of NYC. We also happened to stay there for enough time to catch

a small presentation on the history of New York City. The best part was the simulation of the skyscrapers being built and the evolution of 1600-style shacks to modern buildings. We went to a German restaurant and had a scrumptious dinner. After that, we progressed to the East River's bank near UN Headquarters to watch the annual Independence Day fireworks. The fireworks show that day was like nothing I'd ever seen before, it was spectacular! The unpredictable arcs of red, white, and blue lights lit the entire sky. The last one was colossal - a rocket pierced through the night sky in an infinitesimal fraction of a second and exploded with an enormous display of bright light as sparks flew in a spherical shape. Once the firework show was over, we went back to our hotel and went to bed in preparation for our last day in NYC.

Day 4

With a somber feeling in mind, we started our last day in NYC. We repeated our morning routine and then headed to the Statue of Liberty as humidity and temperature skyrocketed under the scorching sun. The wait time for the ferry including the security check was almost an hour.

As we were approaching Liberty Island, the NYC shoreline glistened behind us. The statue was a gift from France, which was given to the USA on July 4th of 1884. We also heard from a tour guide that people could go inside the statue and stand on top of the torch, but after the attacks of 9/11, National Park Services closed it. We ate lunch at a cafe on the island, then caught the ferry back to Manhattan – my gaze simply couldn't help but be drawn toward the majestic shoreline of New York from the deck of our ferry on the Upper Bay. We then took a ride on the subway to Brooklyn. One can certainly take a comfortable ride in a car to enjoy Manhattan's cityscape from the Brooklyn Bridge, walking on the bridge perhaps adds the extra dimension to it. The Brooklyn Bridge connected Manhattan to Brooklyn spanning across the East River. Its total length is 6,016 feet, and it was completed on May 24th, 1883. Once we reached the Manhattan side, we took a taxi to "The Edge" which is located on the 100th floor of the tallest building at the Hudson Yards. The wind-swept viewing glass floor is somewhat frightening and can give toe-tingling feelings to many. Views over the lower Manhattan skyline are majestic from The Edge. After gazing out to the setting sun from the top of the iconic "edgy" engineering marvel, we left for dinner at an Indian restaurant near Times Square. The restaurant had some of the best biryani I've ever had. The mixture of spices, the taste of the red, orange, and yellow rice on my tastebuds, and the flavor of the goat curry, were all mouthwatering. We ate quickly as we had to go to bed early, for the last time in NYC for this trip.

Day 5

I was awakened in my bed pondering our last few hours in NYC on this trip. After taking a quick shower, I had my breakfast hurriedly as we wanted to utilize every moment of our stay in NYC. We had some time on hand before we headed to the Penn Station to catch the

Cleveland-bound train, so we decided to go back to the New York Public Library. It turned out that the library was open for the first time since the onset of the pandemic. We went inside and looked around. The library is pretty much an extensive museum of old and rare books. We came to know about the underground vault under Bryant Park filled with older and rare books. An astute visitor might recognize this library as it was previously featured in many Hollywood movies. We went to a restaurant to have a quick lunch and caught a taxi to the train station saying GoodBye to this amazing city. We arrived back in Cleveland at around 2.30 AM. It felt just swell to be back home, but I started missing the vibrancy of the city of New York. I wish to go back there someday in the future. I've encountered multiple landmarks, skyscrapers, restaurants, and people on this trip, and I've expanded my knowledge of New York City.

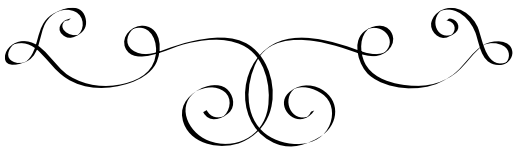

কান পেতে রই

সুজয় দত্ত

আমার ছেলেবেলায় বাবার স্বপ্ন ছিল আমি ডাক্তার হব, দু'কানে স্টেথোস্কোপ গুঁজে গটগট হেঁটে যাব নামী হাসপাতালের করিডোর দিয়ে, সবাই সেলাম ঠুকবে। আমি শেষ অবধি অন্য পেশায় গেলেও আমার নিজের যখন স্বপ্ন দেখার পালা এল সন্তানকে নিয়ে, আমার মনেও সেই একই ছবি এবং এক্ষেত্রেও স্বপ্ন অধরা। তফাৎটা এই যে, বাবার ইচ্ছের মর্যাদা রাখতে আমি অন্তত ডাক্তারীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলাম এবং বেশ ভালো ফলও করেছিলাম। কিন্তু আমার মেয়ে সেই ধার দিয়েই গেলনা, উল্টে একবিংশ শতাব্দীর ক্যারিয়ার চয়েস নিয়ে আমাকে হাত-পা নেড়ে অনেক জ্ঞান-ট্যান দিয়ে এটাই প্রতিপন্ন করল যে ছেলেমেয়েকে ডাক্তার বানানোর এই একমুখী বাসনা বড়ই সেকেলে --- মোটেই যুগোপযোগী নয়। বেশ, তাই সই। হাজার হলেও বিদেশে জন্মে সেখানকার মুক্ত সমাজে বড় হয়েছে --- অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের মতো অ্যারেঞ্জড ক্যারিয়ারও এদের কাছে হাস্যকর বা অকল্পনীয় লাগাটাই স্বাভাবিক।

তবে আমার স্বপ্ন পুরোপুরি অপূর্ণ বলাটা বোধহয় ঠিক হলনা। কানে স্টেথোস্কোপ গোঁজার ব্যাপারটা ভীষণভাবে বাস্তব। সর্বদা, সর্বত্র, সর্বকার্যেষু। যদিও ওটা সত্যি সত্যি স্টেথোস্কোপ নয়, দেখতে কিন্তু অনেকটা তারই মতো। ইয়ারফোন, ইয়ারপড, ইয়ারবাড --- কীসব যেন নাম। আজকাল "জেনারেশন জি"-র ছেলেমেয়েরা (যারা নিজেদের বলে Gen Z --- আমি আড়ালে বলি গেঞ্জি) তো পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় স্মার্টফোন হাতে নিয়ে। আর স্মার্টফোন হাতে থাকলেই তার লেজুড় ইয়ারপড থাকবে কানে। কী যে রাতদিন শোনে ওতে, সে ওরাই জানে আর জানে স্মার্টফোনের অ্যাপ প্রস্তুতকারীরা। বরং আমরা ডাকলে সে-ডাক কানে ঢোকে না। জোরে, চেঁচিয়ে বলতে হয়। ছোটবেলায় হিন্দী সিনেমায় দেখতাম একটা বহুলব্যবহৃত সংলাপ -- "কান খোলকে সুন লো"। ভাবতাম কান তো আর চোখ নয়, চোখের পাতার মতো সে তো আর কানের পাতায় ঢাকা থাকে না, তাহলে "কান খোলকে" বলার দরকার কী? এখন বুঝি কী অসম্ভব দূরদর্শী ছিলেন সেইসব হিন্দী সিনেমার চিত্রনাট্য-লিখিয়েরা। বিংশ শতাব্দীতে বসেই তাঁরা মানসচক্ষে দেখে ফেলেছিলেন একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ "কানের পাতা" দোকান থেকে কিনে পরবে।

যাকগে, এমনিতে যত ইচ্ছে পরুক, কিন্তু পড়াশোনার সময়েও ওদের কানে যখন ওই জিনিস দেখি, মনে ঘোরতর সন্দেহ জাগে পড়াশোনার "প"-ও আদৌ হচ্ছে কী? জিজ্ঞেস করলে বিজ্ঞের মতো বলে, ওটা নাকি ওদের ফোকাস করতে সাহায্য করে। কীভাবে? না, by drowning out other outside noises . শুনে হাসি পায় আমার। আউটসাইড নয়েজের তোরা জানিস কী? জন্মাতিস আমাদের সময়কার কলকাতায় --- বুঝতিস আউটসাইড নয়েজ কাকে বলে। তোদের এই দেশে তো রাস্তায় একটা গাড়ি হর্ন দেয় না, ইলেকট্রিক আর হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিনেরও কোনো শব্দ নেই, বাড়ি ঘর এমন শব্দনিরোধক যে দরজা-জানলা বন্ধ থাকলে পাশের বাড়িতে বোমা ফাটার আওয়াজও বোধহয় শোনা যাবেনা, দিনের বেলা অফিসকাছারীতে চোখ বন্ধ করে ঢুকলে মনেই হবেনা সেখানে কোনো লোক আছে --- এতো নিঃশব্দ। তোরা

নিজেরাও তো দেখি আজকাল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিস না --- একই ঘরে পাশাপাশি বসেও স্মার্টফোনে পুটুর পুটুর করে টেক্সট চালাচালি করিস। তাহলে নয়েজটা কোথায়?

আর আমরা যখন ছোট ছিলাম? সক্কালবেলা ঘুম ভাঙত রান্নাঘরে মায়ের শিলনোড়ায় বাটনা বাটার শব্দে (তাহলে মায়ের ঘুম ভাঙত কী করে? সোজা উত্তর --- বাড়ির কাজের লোক ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটায় এসে দরজায় কড়া নাড়ত) অথবা আশপাশের কোনো ফ্ল্যাটের ধাম্বাল সাইজের ভাল্‌ভ রেডিওতে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন শুরুর বাজনাতে। আর এ'দুটোর কোনোটাই যেদিন হত না, সেদিন শোবার ঘরের খোলা জানলার ঠিক বাইরেই নিমগাছের ডালে কাকের কা-কা রবে। মুখহাত ধুতে ধুতে শুনতাম সামনের রাস্তা দিয়ে "হরি ওম" সংকীর্তনের দল খোলকর্তাল বাজাতে বাজাতে চলেছে। তারপর স্কুল থাকলে চটপট খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে ব্যাগ পিঠে বাসস্ট্যান্ডে ছোটা।

ততক্ষণে শহরের পথে পথে ব্যস্ত সকাল শুরু হয়ে গেছে। সেই সম্মিলিত ব্যস্ততার আর যানজটের শব্দকে এককথায় বোঝানো যায় সম্ভবত একটাই তুলনা দিয়ে ---- মিক্সড ফ্রুটস জ্যাম। কী নেই তাতে? বাসের ইঞ্জিনগর্জন, কন্ডাক্টারের চীৎকার, মোটরবাইকের ভটভট, সাইকেলের টিংটিং, ট্রামের ঠুনঠুন, পথচারীদের কলরব এবং, সর্বোপরি, হর্নের শব্দ। হর্নের যে এতো আশ্চর্য্য সুরবৈচিত্র্য হতে পারে, সেটা মোৎসার্ট বা বেঠোফেন বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় জন্মালে বুঝতে পারতেন এবং তার জন্য তখন সিম্ফনি বা কনচার্টি লিখতেন। সাইকেল রিকশার প্যাঁ-পোঁ, ট্যাক্সির পিঁপ-পিঁপ, বাসের পঁক পঁক, লরির ভ্যাঁক ভ্যাঁক --- সব মিলিয়ে অফিস টাইমের এই বিনিপয়সার অর্কেস্ট্রা অফিসযাত্রীদের মাথাযন্ত্রণা করলেও শুনতেই হবে। রেহাই নেই। এর সঙ্গে আছে বাদুড়ঝোলা বাসের দমবন্ধ ভীড়ে হয়ে চলা নানারকম অম্লমধুর নাটকের সংলাপ, যে নাটকে নিজের অজান্তেই মানুষ রোল পেয়ে যায়। "দাদা ভাড়াটা দেখি, ভাড়াটা বাড়াবেন", "আরে হাতটা নাড়াতে পারলে তবে তো বাড়াব", "ভাই পিছনে সরুন পিছনে সরুন, দরজার কাছে ভীড় করবেন না", "ধ্যাত্তেরি, তুমি নিজেই তো দরজাটা ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছো", "দাদা মেজাজ দেখাবেন না তো একদম, আমার স্টপেজ সামনে তাই এখানে দাঁড়িয়েছি", "কী হল কী, তখন থেকে পা-টা মাড়িয়ে যাচ্ছেন?", "কোথায়? আপনিই তো তখন থেকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে যাচ্ছেন" --- ইত্যাদি চলতে থাকবে সারাটা রাস্তা। চলতেই থাকবে।

স্কুল চত্বরে একবার ঢুকে পড়তে পারলে অবশ্য এসব থেকে মুক্তি। তখন আবার সারাটাদিন ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সহপাঠীদের হৈহৈ-হুটোপাটি-বকবক-চেঁচামেচি। এমনকী ক্লাস চলাকালীনও, যদি দিদিমণি বা মাস্টারমশাইয়ের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা না থাকে। আর মাঝে মাঝে টিচারদের বাজখাঁই গলায় বকুনি, সঙ্গে কাঠের টেবিলে ঠক ঠক করে রুলার ঠোকার শব্দ। যা অনেকসময়ই দেওয়াল ভেদ করে পাশের ক্লাসঘরেও শোনা যায়। টিফিনবেলায় খেলার মাঠে তো সকলে একেবারে উদ্দাম, বাঁধনছাড়া। তখন তাদের কোলাহল শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এরাই আবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে ডেস্কে গিয়ে স্থির হয়ে বসবে।

এ তো গেল স্কুলের দিনগুলোর কথা। আর যখন স্কুল থাকত না --- যেমন রবিবার বা গরমের ছুটিতে? একটু দেরীতে উঠে দাঁতটাত মেজে প্রাতঃরাশ সারতে না সারতেই শুনতাম দরজায় বাইরে একটা পরিচিত ধাতব শব্দ। একটা বড় রূপোলি দুধের বালতিতে হিন্ডেলিয়ামের হাতা দিয়ে ঘা মেরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করছে আগিন মাহাতো। আমাদের দুধঅলা। আমাদের বাড়ীর কাছেই পাড়ার মোড়ে একচিলতে জমিতে একটা খাটাল --- সেখান থেকেই রোজ টাটকা দুধ দুয়ে বালতি করে আমাদের পাড়ায় দিতে আসে। মানে ও তাই বলে আরকি। যাদের দিচ্ছে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই দুধ টাটকাও না, বিশুদ্ধও না। তাই প্রতিদিন দরজার সামনে মা-র সঙ্গে একপ্রস্থ তর্কাতর্কি হত ওর সেই দুধ আজকের না কালকের, গরুর না মহিষের, খাঁটি না

জলমেশানো --- ইত্যাদি নিয়ে। অবশ্য তর্কাতর্কি কোনোদিনই ঝগড়াঝাঁটি বা তিক্ততায় গড়াত না।

খানিক বাদেই জোরালো হাঁক, "বনোয়ারীলাল আইল বাবু-উ-উ"। সেই সঙ্গে আমাদের এবং আশপাশের সব বাড়ীর দরজায় একটা করে ধাক্কা। কানে যেতেই বাড়ীতে বাড়ীতে ঈষৎ চাঞ্চল্য। যার যা অসমাপ্ত কাজ আছে বাথরুমে, চট করে সেরে খালি করে দিতে হবে ওকে। আমাদের গোটা পাড়ার ওই একমাত্র জমাদার। রবিবার আসে পরিষ্কার করতে, কোনোভাবে ফস্কে গেলেই আবার সাত দিনের অপেক্ষা। ও ওর কাজ সেরে বালতি-ঝাঁটা নিয়ে বিদায় হতে হতে বেলা গড়িয়ে যেত। তখন দূরে শোনা যেত একটা তীক্ষ্ণ স্বর --- ক্রমশঃ কাছে আসছে, স্পষ্ট হচ্ছে। "শিল কাটাওএ। শিল কাটাওএ।" প্রতিদিন ভোরে মা-র বাটনা বাটার বা মশলা পেশার কাজটা সময়সাপেক্ষ আর কষ্টসাধ্য না হতে দেওয়ার একটাই উপায়। শিলনোড়াটা নিয়মিত কাটানো, যাতে ভোঁতা না হয়ে যায়। আর বাড়ী বয়ে সেই কাজটা কেউ করে দিতে এলে তো কথাই নেই। প্রথমে একটু দরদাম হতো, তার পরেই সে তার ছেনি-বাটালি আর ছোট্ট হাতুড়িটা নিয়ে বসে যেত বাড়ীর দরজার সামনে। পাথর কাটার একটানা ছান্দিক শব্দের সঙ্গে যে জিনিসটা ঘটতে দেখতাম চোখের সামনে, তাকে ফেলুদা সিরিজের লালমোহনবাবু থাকলে নির্ঘাত বলতেন "শিলনোড়ায় শিল্পকর্ম"। শিল্পকর্মই তো। মাছ, ফুল, আনারস, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, মানুষের মুখ --- শিলের গায়ে এসব ফুটিয়ে তোলা কি মুখের কথা?

এটা যখন চলছে, হঠাৎ কানে আসতো ছেনি-বাটালির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে "ঠ্যান ঠ্যাঠ্যান, ঠ্যান ঠ্যাঠ্যান, ঠ্যান ঠ্যাঠ্যান"। দুয়ে মিলে এক মজাদার যুগলবন্দী। বহুদিন ধরে শুনতে শুনতে এ-শব্দ আমার অতি পরিচিত। জানি এক্ষুণি কী দেখতে পাব। বাড়ীর সামনের রাস্তাটা দিয়ে একহাতে কাঁসার থালা বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাবে এক কাঁসারি। বাড়ীর পুজোআচ্চায় আমি যেমন একটা ছোট লাঠি দিয়ে ঘা মেরে মেরে কাঁসরঘন্টা বাজাই, সেরকমই, কিন্তু এক হাতে। কারণ অন্য হাত দিয়ে সামলাতে হচ্ছে মাথার বিশাল ঝাঁকাটা, যাতে রকমারি আকার ও আয়তনের কাঁসার বাসন। তখনকার দিনের গেরস্তবাড়ীতে যার কদরই আলাদা। তবে কখনো কখনো সেই কাঁসারির পিছনে দেখা যেত এক মুটেকে। ভার বইবার দায়িত্ব তার, আর বাজনা বাজিয়ে বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব কাঁসারির। এক্ষেত্রেও কেন যে সে এক হাতেই বাজাত --- আজও আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

এরা যেসব দিন আসত না, সেদিনের সকালগুলোও মোটেই নীরবে কাটত না। কাঁধে বড়সড় বস্তা ঝুলিয়ে আর হাতে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে পাড়ায় ঘোরাঘুরি করত এক বা একাধিক কাগজওয়ালা --- মুখে "হেই কাগজিয়ে-এ-এ" বা ওরকম ধরণের কিছু একটা হাঁক। কাগজওয়ালা মানে খবরের কাগজ দেওয়ার লোক নয় --- তারা তো আসত আরো অনেক সকালে এবং মোটামুটি নিঃশব্দে। বড়জোর সাইকেলের ঘন্টির দুএকটা ক্রিংক্রিং শুনতাম। কিন্তু এদের উদ্দেশ্য উল্টো --- কাগজ কেনা। সে-কাগজ ঠোঙা বানানো ছাড়া আর কী কাজে লাগত ওদের, জিজ্ঞেস করিনি কখনো। গৃহস্থের ঘরে জমে থাকা যত রাজ্যের পুরনো কাগজের জঞ্জাল এদের হাতে কিলোদরে বিদায় করতে পারলে দায়মুক্তির স্বস্তি, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থলাভও। তবে দেখেছি এদের সঙ্গে দরদামে এঁটে ওঠা ছিল ভীষণ শক্ত। আর তার ওপর ওজনযন্ত্রের একটু আধটু কারসাজি থাকতই। হাজার হোক, ব্যবসা তো!

আর এক ধরণের ব্যাপারীদের সাধারণতঃ দুপুরের আগে আসতে দেখতাম। শানওয়ালা। কাঁধে একটা অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র ঝুলিয়ে (যেটাকে দেখলেই আমার উল্টোনো সাইকেল-রিক্সার কথা মনে পড়ত) ধীরপায়ে হেঁটে যেতে যেতে মাঝেমাঝে জোরগলায় ডাক, "শা-আ-ন। শান দেবে-এ-এ ---- ছুরি কাঁচি বঁটি দা কাটারি-ই-ই"। ওসব জিনিস কে না ব্যবহার করে? তাই বাড়ী-বাড়ী এদের চাহিদা ছিল দারুণ। হয়তো ঘোষবাড়ীর কত্তা কাগজওয়ালার সঙ্গে লেনদেনে

ব্যস্ত যখন, শানওয়ালা এসে টুক করে সরকারবাড়ীতে কাজে বসে পড়ল। তাই দেখে ঘোষগিন্নী ব্যস্ত হয়ে বারান্দা বা রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সরকারগিন্নীকে "ও দিদি-ই-ই, তোমাদের হয়ে গেলে লোকটাকে এখানে একটু পাঠিয়ে দেবে-এ-এ?" বলতেই হয়তো ওদিক থেকে উত্তর এল, "ওরে না-আ-আ, গাঙ্গুলিবাড়ীতে আগে বলে রেখেছে।" এইসব টুকরোটাকরা কথোপকথনও সঞ্চিত হয়ে আছে আমার ছেলেবেলার শব্দস্মৃতিসম্ভারে। আজও মনে পড়ে, শানওয়ালা তার উল্টো সাইকেলের ঘুরন্ত চাকায় ছুরি-কাঁচি ধরলে তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে যে আগুনের ফুলকি বেরোত, সেদিকে আমরা ছোটরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম।

এরপর দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রামের সময়টা একটু নিঃঝুম হয়ে যেত ঠিকই, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই যেসব ডাক শোনা যেত একের পর এক, আমরা মানে কচিকাঁচার দল উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতাম সেগুলোর জন্য। যেমন, "সোনপাপড়ি সন্দেশ --- সন্দেশ সোনপাপড়ি"। আমাদের আবদারে বাড়ীর বড়রা হাত নেড়ে ডাকলে সোনপাপড়ি-অলা এসে খুলে বসত তার বাক্স। "টাটকা হবে তো?" -- এই প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ দিনই তার জোরগলায় দাবী, "আজ সক্কালেই বানানো --- খেইয়ে দ্যাখেন"। কখনোসখনো হয়তো দ্বিধান্বিত স্বীকারোক্তি, "সন্দেশটা আজ আর খাবেননি, এট্টু নেইত্যে গেচে"। কিছু কিছু লোভনীয় বস্তু অবশ্য সারাবছর নয়, মিলত বিশেষ বিশেষ ঋতুতে। "জ-অ-অ-য় নগরের মোয়া-আ-আ" ডাকটা কি আর বৈশাখের কাঠফাটা রোদে বা শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টিতে মানায়? ওটার জন্য লাগে শীতের বিকেলের মিঠে রোদ। ঠিক তেমনি "জামরুল নেবে জামরুল, ভাল কালোজাম আছে" ছিল জ্যৈষ্ঠমাসের আকর্ষণ। একই কথা প্রযোজ্য "কোয়ালিটি ! কোয়ালিটি !!" সম্বন্ধেও। আইসক্রীম দুনিয়ার নামজাদা কোম্পানী "কোয়ালিটি"-ই হোক অথবা তার অন্যরকম বানান-অলা নকলই হোক, ছোট্ট দুচাকার ঠেলাগাড়িতে রংবেরঙের কাঠি-আইসক্রীমের ছবি দেখলেই সেই গুমোট গরমের বিকেলগুলোয় হ্যামলিনের বাঁশিঅলার মতো আমরা তার পিছু নিতাম।

সেইসময় ছোটদের কাছে কাঠি আইসক্রীমের সঙ্গে জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিতে পারার মতো আরেকটা জিনিস ছিল, যার ফেরিঅলাকে কোনো হাঁকডাক করতে হত না। তার হাতে থাকত শুধু একটা ঘন্টা। মন্দিরে আরতির সময় যেমন ঘন্টা বাজে, সেরকম টুংটাং আওয়াজ তুলে সে পাড়ায় ঢুকলেই শুরু হত বাচ্চাদের বায়না --- "বুড়ির চুল খাব"। নামটা যেমন, ওটা দেখতেও ঠিক সেরকম --- থুথথুড়ে বুড়ির শনের নুড়ির মতো সাদা চুল যেন। অবশ্য গোলাপী রঙেরও পাওয়া যেত। আর মুখে দিলে? নিমেষে উধাও! শুধু একটা ঠান্ডা, মিষ্টি রেশ যা ক্ষণিকের হলেও পরম তৃপ্তিদায়ক।

এইসব যতক্ষণ চলছে, বাড়ীর মা-মাসী কাকিমা-জ্যেঠিমারা অবশ্য বসে নেই। "ঘুটিয়া লিবে গো --- ঘুটিয়া-আ-আ" চীৎকারে তাঁদের ভাতঘুম অনেক আগেই ছুটে গেছে। শুরু হয়েছে ঘুঁটেঅলাকে ডেকে বাড়ীর দরজায় বা উঠোনে বসিয়ে ঘুঁটে গোনার পর্ব। সে এক মজার ব্যাপার। ক্রেতা আর বিক্রেতার গুনতিতে কিছুতেই মেলে না। বার বার গোনা হয় একই জিনিস। ক্রেতার দাপটই বেশী, তবে বিক্রেতাও ছাড়নেওয়ালা নয়। হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে চলতে থাকে এক বিচিত্র কথোপকথন। এর চেয়ে অনেক শান্তিপূর্ণ বিকিকিনি হত শাঁখারি এলে। সারাদিন যত ডাক শুনতাম সেই সময়, আমার মতে তার মধ্যে সবচেয়ে সুরেলা আর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল এদেরটা। শাঁখা-পলা তো আর ঘুঁটের মতো নোংরা, দুর্গন্ধময় বস্তু নয় --- পবিত্র মঙ্গলচিহ্ন। আর এক্ষেত্রে গোনাগুনিরও ব্যাপার নেই কারণ ওসব ডজন-দরে বিক্রি হয়না। সুতরাং শাঁখারির ছোট্ট বাক্সে সাজানো সারি সারি সাদা-লাল বৃত্ত থেকে বেছে বেছে নিজেদের পছন্দমতো পণ্য খুঁজে নেওয়াটা যথেষ্ট ধীরস্থিরভাবে, সময় নিয়ে করতেন ক্রেতারা। আর বিক্রেতাকেও বিরক্ত হতে দেখিনি কখনো।

ক্রেতা-বিক্রেতার এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে। সেই গোধূলিবেলায় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ডেকে যেত পাড়ায় পাড়ায়। কাঁধের ঝুলিতে একগোছা বই --- লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনিদেবের পাঁচালী, মনসামঙ্গল, মেয়েদের ব্রতকথা, এমনকী বর্ণপরিচয় অবধি। গেরস্তবাড়ী থেকে ভেসে আসা শাঁখের শব্দ আর পাড়ার মন্দিরে আরতির ঘন্টাধ্বনির সাথে মিশে পাক খেতে খেতে শূন্যে মিলিয়ে যেত সে-ডাক। এইভাবেই দিনের মুখরতা শেষ হয়ে চুপিসাড়ে নেমে আসত রাত্রির নৈঃশব্দ্য।

ত্রি না হলেও, আমার প্রজন্মের যাঁরা তাঁদের জীবনে এখন অপরাহ্নের ছায়া। সন্ধ্যে ঘনাতে বেশী দেরী নেই। জীবনের এই গোধূলিবেলায় নিভৃত মুহূর্তগুলোয় যখন মনকে এক স্মৃতিমেদুর অন্তর্মুখিতা এসে জড়িয়ে ধরে, ফেলে আসা দিনগুলোর টুকরো টুকরো ছবি হঠাৎ জেগে উঠেই মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো, তার সঙ্গে ভেসে আসে কিছু শব্দও। বুকের গভীরে অনুরণন তোলে তারা --- স্মরণের বীণাতারে মৃদু ঝংকার দিয়ে আবার হারিয়ে যায় কোন অতলে। অবাঞ্ছিত 'আউটসাইড নয়েজ' তারা আগেও ছিলনা, এখনও নয়। অন্তরের অন্তঃস্থলে অহরহ তাদের জন্যই তো কান পেতে রই।

শারদ শুভেচ্ছা

জয়দীপ, অম্বালিকা , পিয়াল দাসগুপ্ত , কোয়েল ও গাভান লকহার্ট

Middle Name

ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী

"হুঁ হুঁ বাবা, ফেয়ারনেস ক্রিমের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি সাহেব বানায়। তার ওপর আবার এটা পার্মানেন্ট!" এটা হল পশুপতিদার বক্তব্য, আমাদের, বাঙালিদের, middle name এর ব্যাপারে। "যবে থেকে আমরা সাদা চামড়া আর মধ্যনামের মধ্যে একটা correlation বের করেছি, আমরা বলতে পারিস গণহত্যা করেছি আমাদের নামের। দু-একটা উদাহরণ দেখ। রমণীমোহন চৌধুরী 'Ramani M Chowdhury' হয়ে ফর্সা তো হলই না, উল্টে পৌরুষ চলে গেল - হেঁ হেঁ, ঠিক যেমন হয় ফেয়ারনেস ক্রিমে।"

আমিও একটু উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, "মনমোহন সিং 'Man M Singh' হলে পৌরুষকে emphasize করতে পারতো। আবার শিবপদ আর পদতলে না থেকে নিজেই শিব হতে পারে।"

"আবার যারা মধ্যনাম রেখে ফর্সা হতে চায়না, তাদের জোর করে ফর্সা করে BCCI।"

"কীরকম?"

"সৌরভ গাঙ্গুলী ষোল বছর শুধুই সৌরভ গাঙ্গুলী ছিল। ইস্কুলের রেজিস্টারে সেটুকুই নাম আছে। রঞ্জিতে খেলল, আর নাম বেড়ে হল 'সৌরভ চন্ডিদাস গাঙ্গুলী'। মজাটা হল, সৌরভের বাবা আবার 'চন্ডি দাস গাঙ্গুলী', 'চন্ডিদাস গাঙ্গুলী' নয়। এটা বলতে পারিস শিবপদ আর রমণী মোহনের hybrid case - লিঙ্গ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু দাসত্ব ঘুচেছে।"

পশুপতিদা আগে কিছু একটা ভালো চাকরি করতো। গতবছর সাহানা বৌদি মারা যাবার পর মাস দুয়েক কাজে না গিয়ে চাকরি হারায়। তারপর এই চায়ের দোকান খুলেছে। নাম দিয়েছে "চায় বাহাদুর"। বলে, "নানান লোকজনের কথা শুনতে ভালো লাগে, তাই এই দোকান।" আমি বলেছিলাম, "মদের দোকান খুললে আরো বেশি কথা শুনতে পেতে তো"! তার উত্তরে পশুপতিদা বলেছিল, "চা কে underestimate করিস না। চায়ের আড্ডা থেকেই বাঙালির renaissance, আর বাঙালির অবক্ষয়।"

ক'দিন বন্ধ ছিল চায়-বাহাদুর। পাশের দোকান থেকে বলল পশুপতিদাকে কী একটা কাজে খবরের কাগজের অফিসে, কোর্টে, আরো কোথাও কোথাও যেতে হচ্ছে ক'দিন। চা বাড়িতেও খাওয়া যায় - কিন্তু বাঙালির renaissance আনা আড্ডা আর বিশেষ কোথাও পাবো না। কাজেই দলবল নিয়ে রোজ বিকেলে একবার করে ঢুঁ মারতে লাগলাম। অবশেষে একদিন দোকান খোলা পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ছিলে পশুপতিদা?"

পশুপতিদা একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ফর্সা হব এবার।" পড়ে দেখলাম, পশুপতিদা একটা middle name লাগিয়েছে। পশুপতিনাথকে ভেঙে "পশুপতি নাথ" নয়। proper middle name। এখন পুরো নাম, "পশুপতিনাথ সাহানা মণ্ডল"।

Lamb Boti Kabab

Ananya C Biswas

This dish is very simple, delicious, and easy to make at home. Boti Kabab reminds me about mouth-watering Indian Street Food that we can comfortably make in our own kitchen. This is a years old North Indian recipe, and I modified and incorporated personal touch to enhance cooking experience and deliciousness. I always enjoy these juicy and tender Boti Kababs with my family and friends. This non vegetarian dish is not only easy to make but also healthy to eat, everyone must try it at home.

Boneless Leg of Lamb

Marinated Lamb Cubes

Lamb Cubes in Skewer

Lamb Boti Kabab

INGREDIENTS

- Boneless leg of the Lamb meat (3lbs)- cut into small ½ to ¾ inches cubes
- Plain yogurt non-fat/whole (1lb)
- 2 tsp of cumin and coriander powder, 1 small tsp of chilli powder, 1 tsp of garam masala, ½ tsp of ginger and garlic powder each
- 1 tsp of crushed dried fenugreek leaves "Kasoori Methi"
- 1/4th cup of extra virgin olive oil

- Salt to taste, 1/4th tsp of sugar, 3-4 tsp lime juice
- Sliced red onion and cucumber with fresh green chillies and limes for garnishing
- 4 – 6 stainless steel Kabab skewers

PREPARATION STEPS

1. Wash hands thoroughly with soap and water.
2. Rinse and clean the meat with warm water and dry it properly with paper towels.
3. On a clean chopping board cut the boneless meat into small ½ to ¾ inches cubes, put the cut meat in a clean glass bowl.
4. Add lime juice, salt, sugar, all dry powder ingredients into the cubed meat.
5. Mix all spices thoroughly with the meat.
6. Add yogurt and oil into it, mix all ingredients uniformly with meat for 3 to 5 minutes.
7. Set aside the meat in refrigeration for 3 to 5 hrs (2 hours minimum) for proper marination.
8. Once marinated, take individual meat cubes and put it into the skewers. Eight to ten cubes in each depending on the length of the skewer.
9. While preparing the skewers, preheat the oven to 375°F.
10. Put the skewers side by side on a dripping tray before putting it in the oven.
11. Once the oven temperature reaches 375°F, put the whole tray with skewers in it.
12. Bake for 15 to 20 mins then rotate the skewers. Make sure to wear oven gloves before working with the hot skewers.
13. Bake for another 15 to 20 mins to achieve juicy and tender kababs.
14. Take out the Lamb Boti Kababs from the oven and serve it on a plate with sliced red onion, cucumber, fresh green chillies, and sliced lime garnish.
15. Enjoy your mouth-watering tasty, juicy Boti Kababs with plain/brown rice or Naan-Bread, “Bon Appétit”.

সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই

নবীন সাহানা শ্রীদীপ মেলনী নীলাঞ্জন

অর্জুন ও মায়া

Best Wishes and Puja Greetings

Tatini and Sanchita Mal Sarkar

শারদীয় অভিনন্দন

চ্যাটার্জী পরিবারের পক্ষ থেকে

কালিন (নাতি), পরিতোষ , রেখা , মিমি, ম্যাট , হেতা , রাজু

ও কবি

Sharodiya Shubhechha

Indrani

Kalyani

Mahua &

Jayatu Das Sarma

অলিভিয়া নাথ (১৪ বছর)

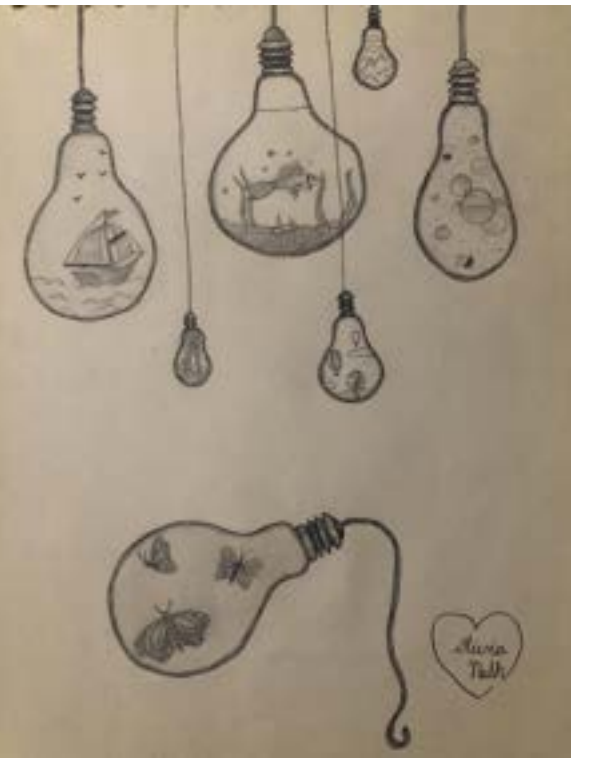

দেবলীনা মাইতি

ইন্দ্রাণী কর

অনুশ্রী কুন্ডু (৫ বছর)

অর্জুন কুন্ডু (৭ বছর)

আনাভি বিশ্বাস (১২ বছর)

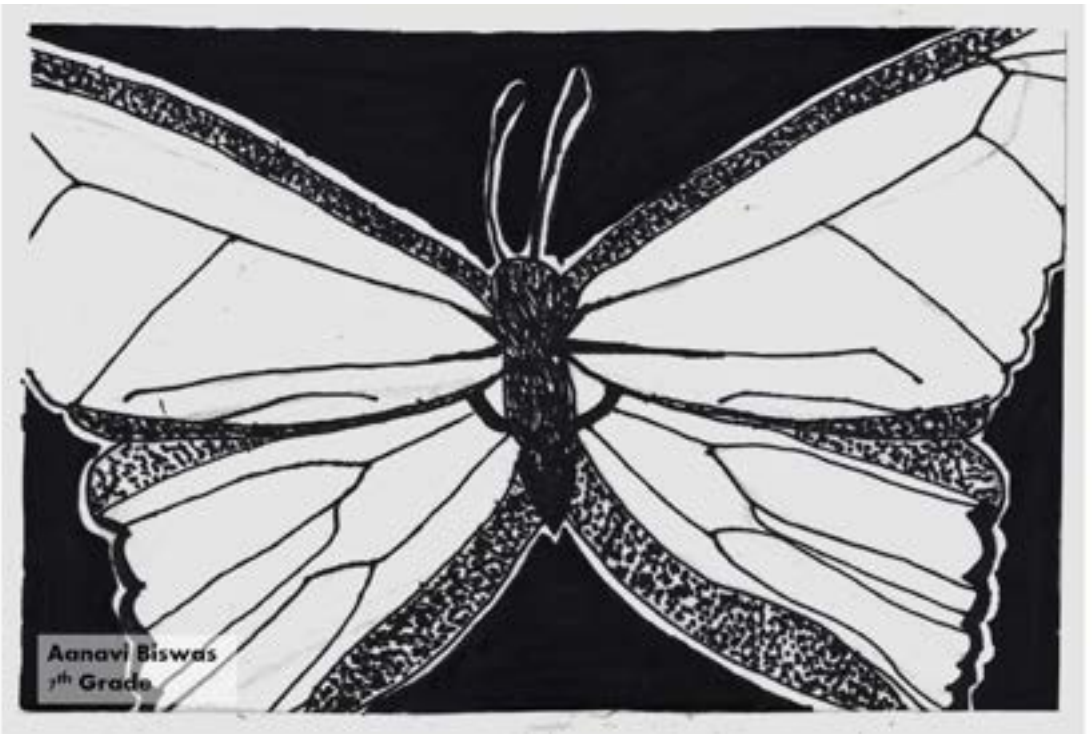

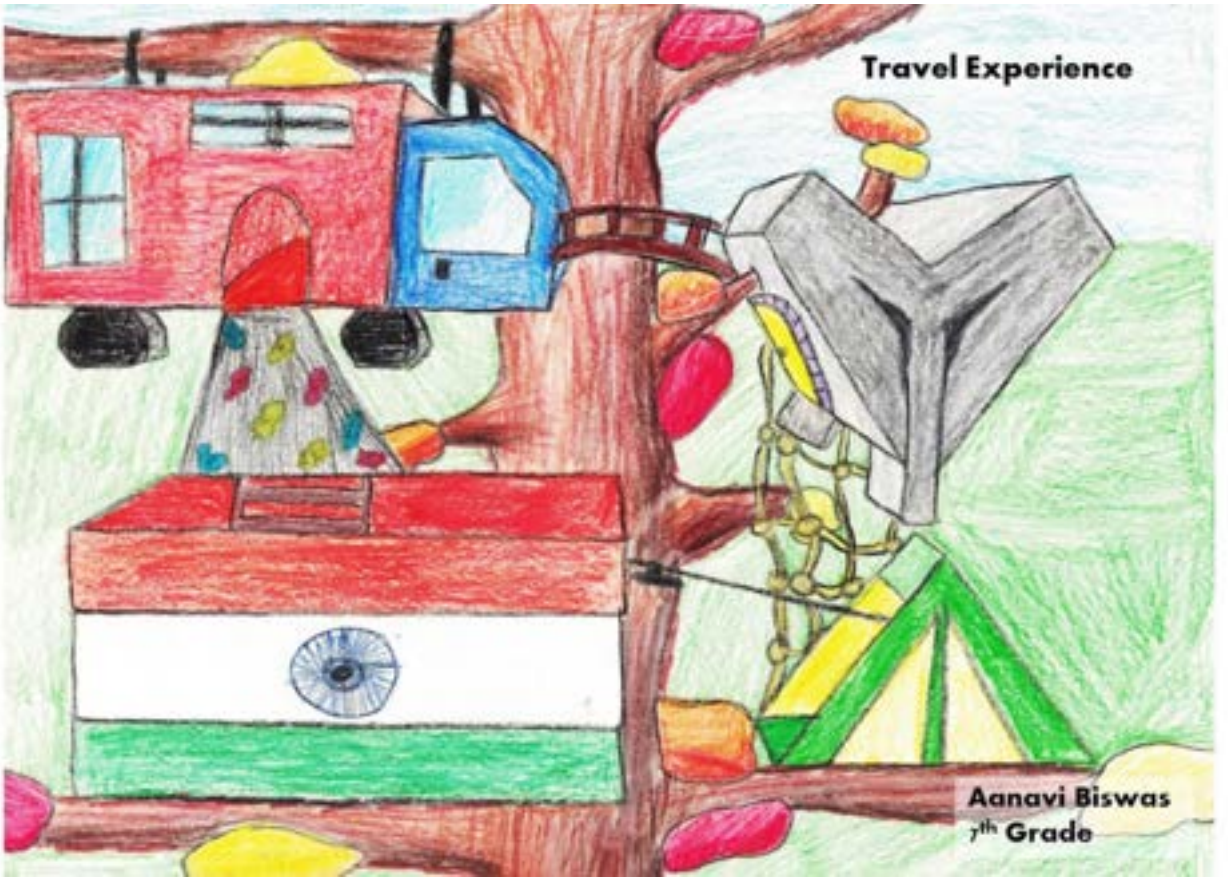

আঁখি তালুকদার (একাদশ শ্রেণী)

অনহিতা চৌধুরী (৯ বছর)

অন্বেষা রায় (৫ বছর)

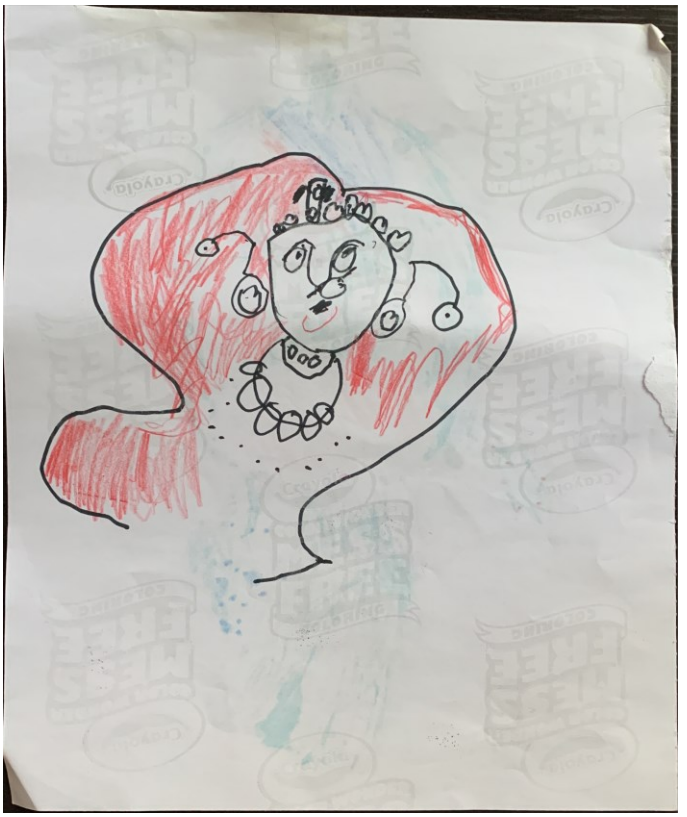

আরিয়ান ঘোষ (১৩ বছর)

মধুমন্তী রায় বর্মন

আইলীন ব্যানার্জী (৪ বছর)

কল্যাণী দাস শর্মা ৭ বছর)

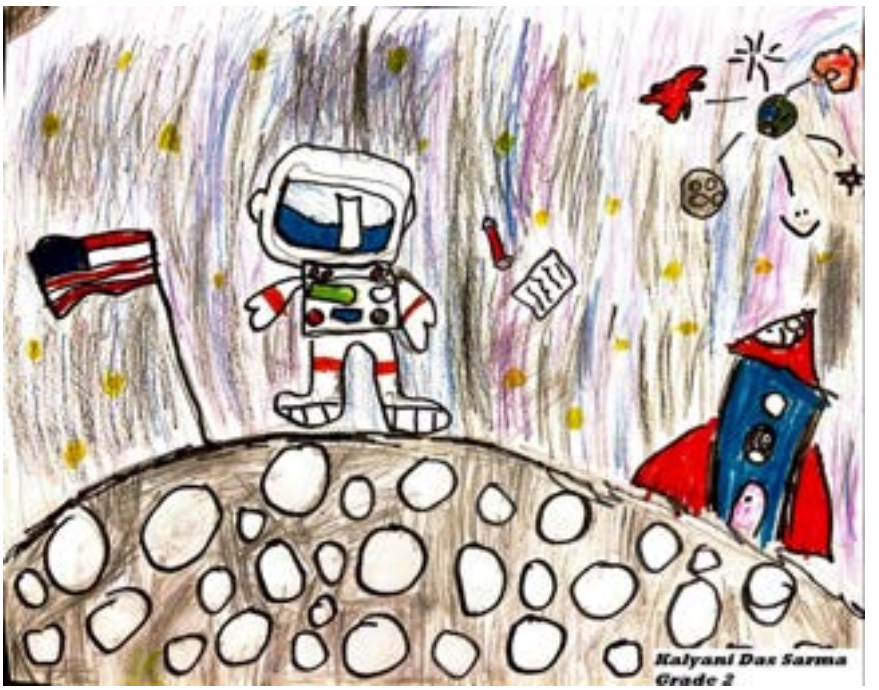

নেহালি দে (৯ বছর)

রোহন ঘোষ (১০ বছর)

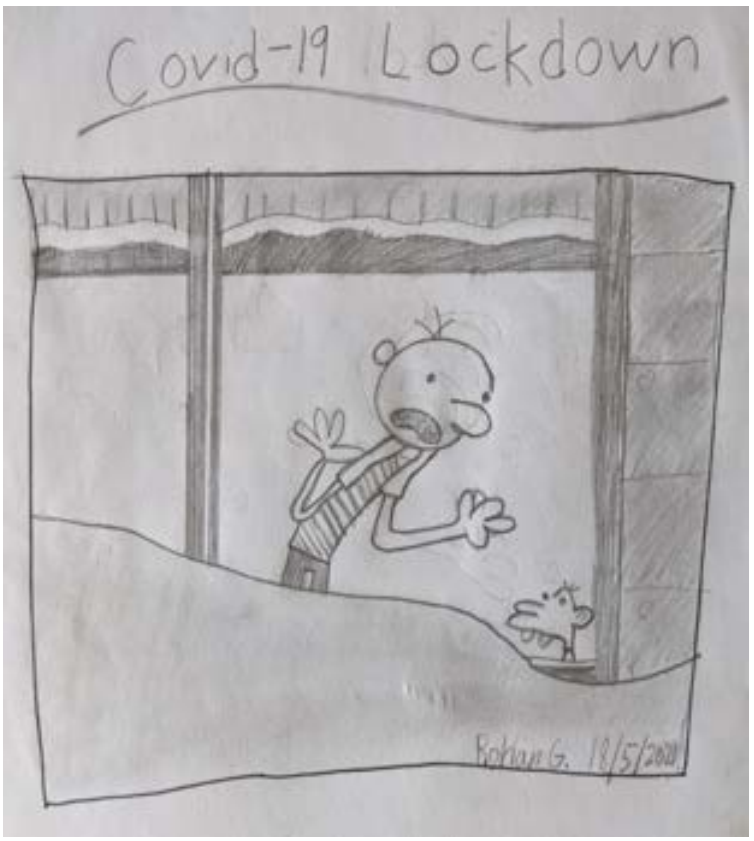

সৌরীশ মন্ডল (৮ বছর)

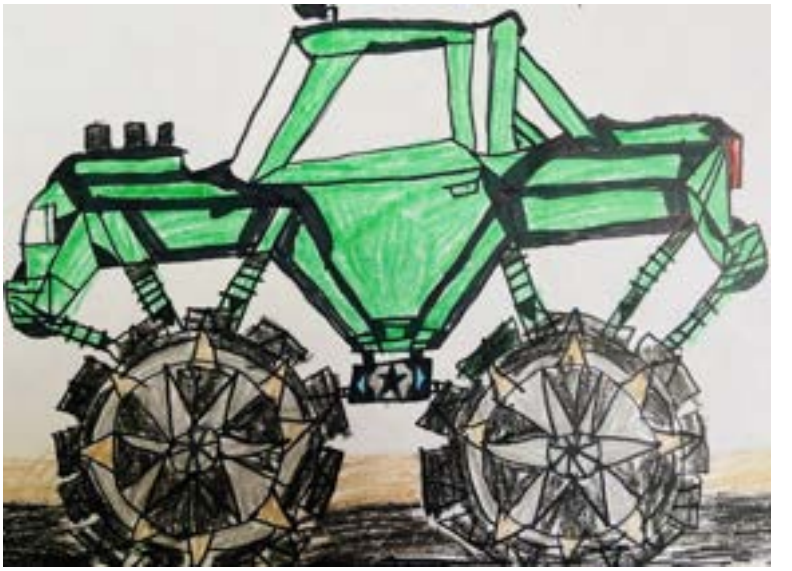

ইন্দ্রাণী দাস শর্মা (১৩ বছর)

শৌর্য ভট্টাচার্য (১১ বছর)

অনুষ্কা গোস্বামী (১০ বছর)

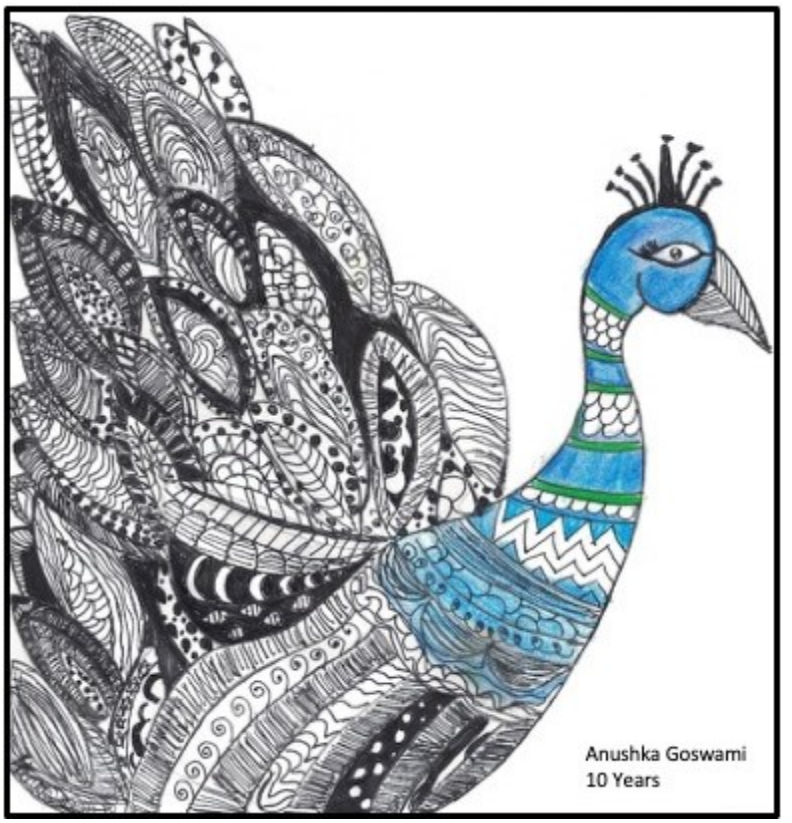

ঋদ্ধিমা দেব (১৪ বছর)

আভান বিশ্বাস (৮ বছর)

ঋষভ দেব (৯ বছর)

গার্গী চৌধুরী

সোনাক্ষি মন্ডল (১২ বছর)

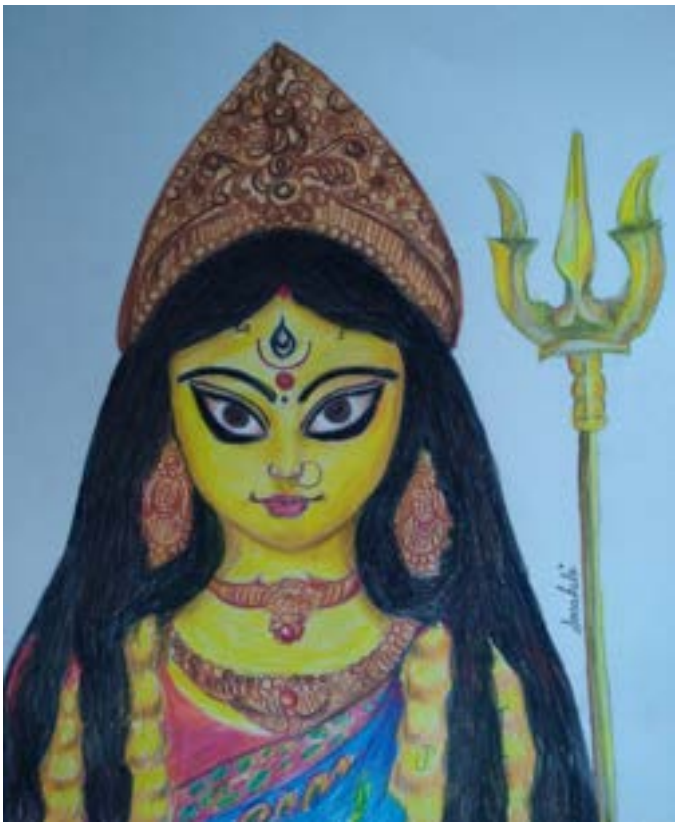

স্নেহাক্ষি মন্ডল (৭ বছর)

সুমিত চক্রবর্তী (১৪ বছর)

সুমন চক্রবর্তী

Best wishes for Durga Puja from Anjan, Kathy, Julie-Anne and Monica Ghose

শারদীয়া শুভেচ্ছা

- পার্থ, রানী , অনিকেত ও অয়না

Happy

DURGA PUJA

Brati, Roohan, Soumen

বিজয়ার প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা জানাই।

Amit,Tanya, Rishav & Rhine

2021

শারদীয়া অভিনন্দন

গণেশ সেন, ইন্দিরা সেন

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি"
সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই

Nitis, Chandana, Richik, Andrea,
Prateek Sarkar , Adrienne Day,
Diyamoni Sarkar, Harry and Otis

Bijoya Greetings & Best Wishes from Pratyay, Anuraag, Priya & Pallab

শারদ শুভকামনায়

রতন, বাসবী,

তিয়া ও তানী মৈত্র

May Ma Durga Bring All Happiness To You And Your Family

শুভ বিজয়া

শুভ বিজয়া

SARAH, SOMA, SUBHRA, SANHITA AND SADHAN JANA

FAIRLAWN, OH